দাম : ষোলো টাকা

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসা কোনো নতুন শব্দ নয়— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসা ছিল রাজনৈতিক মোড়কে হিন্দু-গণহত্যা — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২০ মে, ২০২৪।। ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

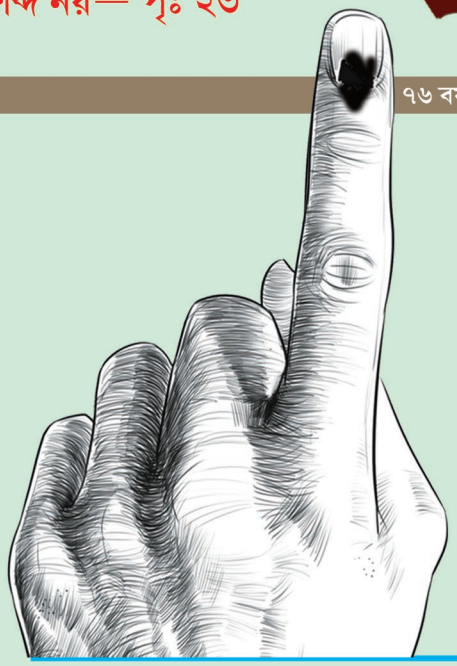

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই আতঙ্ক

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২০ মে - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

জেকিল আর হাইডের খেলায় মমতার পতন অনিবার্য— কাক কাকের মাংস খাচ্ছে ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

পশ্চিমবঙ্গের জন্যও মোদীর গ্যারান্টি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

দেশে দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলে ইসলামিক রণনীতি ☐ ইমতিয়াজ মেহমুদ ☐ ৮

তৃতীয় দফার লক্ষ্যে এখনই অবিচল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

একুশের ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস ছিল রাজনৈতিক মোড়কে হিন্দু-গণহত্যা ☐ রামব্রহ্ম দেবশর্মা ☐ ১১

রাজ্যপালকে জড়িয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক, আঘাতটা সংবিধানের ওপরেই ☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে রিগিং রসায়ন ভোটের নামে প্রহসন ☐ দেবজিৎ সরকার ☐ ১৫

দেশ পরিচালনায় নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসা কোনো নতুন শব্দ নয় ☐ হীরক কর ☐ ২৩

ভোট গণনায় কারচুপি ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই আন্তরিক? ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ২৮

তথাগত বুদ্ধ—বিবেক ও রবীন্দ্র মানসে ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩১

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রতাপাদিত্য উৎসব পালনের যৌক্তিকতা ☐ শ্রীমান চক্রবর্তী ☐ ৩৩

হিন্দুত্ব বিনষ্ট হলে ভারতের পতন অনিবার্য ☐ অমিত কুমার চৌধুরী ☐ ৩৫

ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে বাম-ইসলামিক অপপ্রচার ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ৪৩

কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন চাই ☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ স্মরণে : ৪৭-৪৮ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে ২৭ মে, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৭ মে, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

রাসবিহারী বসু, ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য মহাবিপ্লবী। তাঁর তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতি এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রাসবিহারী বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মকাণ্ডের দিকগুলো আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক। কাজী নজরুল ইসলামের ওপরও থাকবে কয়েকটি আলোচনা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শুধুই লজ্জা

ভারতে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎসব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সেই উৎসবে ভোটাররা তাহাদের মনোমতো প্রার্থীকে ভোট দান করিয়া গণতন্ত্রকে আরও মজবুত করিয়া থাকেন। ভোট ঘোষণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিটিং, মিছিল, দেওয়াল লিখনে এক-একটি দলের কর্মীরা মাতিয়া উঠিতেন। দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গাত্মক ছড়া মানুষ রসিয়া রসিয়া উপভোগ করিতেন। আর ভোটের দিন সত্যিকারে উৎসব লাগিয়া যাইত। ভোটকেন্দ্রের অনতিদূরে বিভিন্ন দলের কর্মীরা মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভোটারদিগকে ডাকিয়া বসাইয়া চা, কোথাও কোথাও মুড়ি-ঘুগনি সহযোগে আপ্যায়ন করিত। ভোটাররা সব দলেরই ঠেকে যাইয়া চা পান করিত। সবাইকেই হাসিমুখে বলিত ভোট তাহাদের প্রার্থীকেই দেওয়া হইবে। সকলেই তাহা বিশ্বাসও করিত। ভোটকে কেন্দ্র করিয়া তখন কোনোপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিত না। পুলিশ মাঝে মাঝে টহল দিয়া ফিরিত। ভোটের দিনে বর্তমানে এই উৎসবের পরিবেশ উধাও হইয়াছে। পূর্বের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের আমদানি ঘটাইয়াছে কংগ্রেস দল। ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া তাহারা ক্রমশ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহারা ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করিয়া ভোটারদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে শুরু করিয়াছিল। প্রথম ভোট লুঠের পথপ্রদর্শক তাহারাই। ১৯৭২ সালে সিপিআইএম কংগ্রেসের ভোট রিগিঙের প্রতিবাদ করিয়া রাজ্য জুড়িয়া ভোট বয়কটের ঘোষণা পর্যন্ত করিয়াছিল। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসকে বিদায় জানাইয়া বামেদের ক্ষমতায় আনিয়াছিল। কিন্তু কী দুর্দৈব, অচিরেই বামেরা কংগ্রেসের সেই রিগিংকে আত্মসাৎ করিয়া শতগুণে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তাহাদের ভোট চুরিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বৈজ্ঞানিক রিগিং বলিয়া অভিহিত করিলেন। তাহাদের রিগিং শুধুমাত্র ভোটের দিনই সংঘটিত হইত না, সংবৎসর ধরিয়া ইহার ক্রিয়ান্বয়ন চলিত। ভোটার তালিকা হইতে বিরোধী সমর্থকদের নাম বাদ দেওয়া, বিরোধী প্রার্থীর স্ত্রীদিগকে সাদা থান প্রেরণ করা, বিরোধী প্রার্থীদিগকে মনোনয়নপত্র জমা করিতে বাধা প্রদান, ভোটের পূর্বদিন ভোটকর্মীদিগকে ভীতি প্রদর্শন করাইয়া তাহাদের কথা শুনিতে বাধ্য করা ইত্যাদি তাহারা প্রকাশ্যে করিত। ভোটের দিন বুথ জ্যাম করা, বুথের লাইনে বোমা ফাটাইয়া ভোটকেন্দ্রকে ফাঁকা করিয়া ছাপ্পা ভোট দেওয়া, শহরের বড়ো বড়ো আবাসনগুলির মূল ফটকে বোমাবাজি করিয়া আবাসিক ভোটারদিগকে ভোটদানে বিরত রাখা ইত্যাদিও তাহারা নিপুণ হস্তে করিত। ইহার ফলেই ভোট গণনার দিন দেখা যাইত, প্রকৃত ভোটারের চাইতে বহু বেশি ব্যালট পেপার ব্যালটবক্সে রহিয়াছে। ভোট গণনাকারী আধিকারিকরাও শাসকদলের বশংবদ হইবার কারণে জয়ী প্রার্থীকেও পরাজিত ঘোষণা করিতেন। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহারা এতটাই মরিয়া হইয়া পড়িয়াছিল যে ব্যালট জিতিতে বুলেটেরও ব্যবহার করিতে থাকে। বস্তুত, ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসিয়াই তাহারা সন্ত্রাস ও কারচুপিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু মানুষ এক সময় তাহাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাদেরও রাজ্যছাড়া করিয়া ফেলে।

বামেদের নির্লজ্জ অত্যাচার ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদেই মানুষ বর্তমান শাসকদলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহারাও কিন্তু বামেদের সন্ত্রাস ও রিগিংয়ের পরিণাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বামেদের সমস্ত অপগুণ সহস্র প্রকারে আয়ত্ত করিয়া মূর্তিমান বিভীষিকায় পরিণত হইল। তাহারা একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করিবার জন্য রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করিবার সমস্ত রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। বিরোধী পক্ষের কর্মী, সমর্থকদের হত্যা করিয়া গাছে ঝুলাইয়া দিয়া আত্মহত্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছে। পঞ্চায়েত, বিধানসভা অথবা লোকসভা সমস্ত নির্বাচনেই বামেদের চাইতে শত সহস্রগুণ সন্ত্রাস ও রিগিং প্রত্যক্ষ করিয়াছে এই রাজ্যের মানুষ। তাহারা পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে এক-একটি সন্দেশখালি নির্মাণ করিয়াছে। সেথায় এক-একজন শেখ শাজাহান তৈয়ারি করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী সেইসব শাজাহানদের আশ্রয়দাত্রী রূপে বরাভয় প্রদান করিতেছেন। সেই জন্যই বোধহয় এই রাজ্যের বর্ষীয়ান রাজনীতিক তথাগত রায় বলিয়াছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন সিপিআইএমের যোগ্য ও সেরা ছাত্রী। সমগ্র ভারত দেখিতেছে, তাহার শাসনে পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা না দিয়াও চাকুরি পাওয়া যায়, ভোট না করিয়াও জয়লাভ করা যায়, ছবি না আঁকিয়াও কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা যায় এবং সাহিত্য প্রতিভা না থাকিলেও আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া যায়। ইহাই এখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। আজ পশ্চিমবঙ্গের হইতে বাকি ভারত যাহা শিখিতে পারে তাহা হইল, সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং ভোটের জালিয়াতি। ইহা বাঙ্গালির লজ্জা, এই রাজ্যের লজ্জা। শুধুই লজ্জা।

সুভাষিতম্

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ।।

এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চরিত্রবলেই ত্রিলোক জয় করা যায়। চরিত্রবান ব্যক্তির পক্ষে এই সংসারে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়।

জেকিল আর হাইডের খেলায় মমতার পতন অনিবার্য

কাক কাকের মাংস খাচ্ছে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জালিয়াত আর মিথ্যাবাদী বলে পরোক্ষে নিন্দা করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। অনেকের দাবি তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। এরপর ৪২ আসনের লড়াইয়ে মমতা পিছিয়ে পড়লে তিনি মনে মনে হর্ষোল্লাস করবেন। মমতা যাদের নিয়ে প্রশাসন চালান আর রাজনীতি করেন তাদের বেশিরভাগকেই পছন্দ করেন না অভিষেক। প্রায় তিনদশক পুরোনো তৃণমূলের খোলনলচে তিনি বদলাতে চান। তাই তারা কাদায় পড়লে অভিষেক খুশি হন। রাজনীতিতে যে কে কার ক্ষতি চায় ধরা মুশকিল নয়। দলের ভিতর মমতা বনাম অভিষেকের কৌশলগত লড়াই নতুন নয়। অভিষেক স্বীকারও করেছেন। পেশাদারি সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভোট লড়তে চান অভিষেক।

পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে রেখে লড়তে চান মমতা। অভিষেকের কাছে এরা 'মরা কাঠ' তাই ফেলে দেওয়া ভালো। আগুন ধরে না। অভিযোগ, রাজ্যে মমতা আর অভিষেক দুর্নীতির মাথা। তাই দুটো মাথাই কেটে ফেলা উচিত। ফল বেরোলে বোঝা যাবে রাজ্যের মানুষ দুর্নীতিকে রাখতে চায়, না মদত দিতে চায়। আদালতের রায়ে বিরোধীদের দাবিতে সিলমোহর পড়েছে। বিরোধী বলতে বিজেপি। বাকি অপাঙ্‌ক্তেয় ক্ষয়িষ্ণু, রোগগ্রস্ত আর ক্ষীণ। অনেকদিন থেকেই বিদেশি সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ আর বিজেপির বর্তমান তমলুক প্রার্থী লড়াইটাই চালিয়ে আসছেন। মানুষ ইডি-সিবিআই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তবু অনেকে বলছে 'চোর ধরছে বিজেপি'। তারা জানেন আদালতের নির্দেশেই তৃণমূলের ২৭ জন নেতাকে জেলে ভরা হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে কংগ্রেস মুছে যায় ২০০৪ থেকে ২০১৪-র মধ্যে এক ঝাঁক দুর্নীতির বোঝা মাথায় নিয়ে।

লোকসভায় ৪০০-র বেশি আসন পাওয়া কংগ্রেস এখন ৪০-এর কাছে নেমে গিয়েছে। তাদের দুর্নীতি পারিবারিক আর দলীয়। ঠাট্টা করে কংগ্রেসকে বলা হতো— ২-জি, ৩-জি, কোলজি (কোল গেট দুর্নীতি) জিজাজি (রাহুল গান্ধীর জামাইবাবু রবার্ট বঢরা) আর সোনিয়া। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের মিডিয়া অ্যাডভাইসার ড. সঞ্জয় বারু তাঁর 'অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' বইতে লিখেছিলেন, ১০ জনপথ (সোনিয়ার বাড়ি) থেকে কীভাবে রিমোট কন্ট্রোলে ক্যাবিনেট চলত। ড. বারু একসময় দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসকাগজে আমার সম্পাদক ছিলেন। এ রাজ্যের মানুষের কাছে কংগ্রেস বলতে বহরমপুরের অধীর চৌধুরী যেমন ছিলেন, তেমনই পঞ্জাবের অমরিন্দর সিংহ। রাজনৈতিকভাবে অমরিন্দর শেষ হয়ে গিয়েছেন। হয়তো অধীরবাবুর নৌকাডুবিও আসন্ন।

সমীক্ষা বলছে, এবারের ভোটে বিজেপির অনুকূলে চমক আসছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায়। তবে এর মধ্যে 'চমকপ্রদ চমক' কেবল পশ্চিমবঙ্গে।

১৯৭৭ সাল থেকে ৩৪ বছর ধরে অত্যাচার আর অবিচারের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বিদেশি বাম দলগুলি। বিধানসভা ও লোকসভায় তাদের কোনো আসন নেই। বামেদের মানুষ কোলশূন্য করে দিয়েছে। তাদের সেই অত্যাচারের পর মানুষ তাদের ক্ষমতায় ফেরাবেন সে মিথ্যা আশা কুহকিনী। অধীরবাবু বা অমরিন্দররা কংগ্রেসি নন। নিজেদের নামে ভোট জিততেন। মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী, আনকোরা ছাত্র নেতা সৃজন ভট্টাচার্য আর দীপ্সিতা ধর মানুষের কাছে যদি প্রমাণ করতে পারেন তারা আগমার্কা সিপিএম নন তাহলে অঘটন হতে পারে। রাজ্যের সবটাতেই ঘিরে রয়েছে মমতার সীমাহীন দুর্নীতি। তাতে শাসক দলের সবাই ডুবে রয়েছেন।

কেউ ফয়দা তোলার চেষ্টা করছেন নিজের রাজনৈতিক লালসা পূর্ণ করা আর প্রতিরক্ষার জন্য আবার কেউ লড়ছেন দুর্নীতির হাত থেকে মানুষকে নিস্তার দিতে। দুটো লড়াই দু'রকমের। কেউ নিজের ঘর ভেঙে নতুন করে দল ও ঘর বানাতে চান মমতার সৈনিক হয়ে। আর আড়ালে 'কাক কাকের মাংস খায়— যিনি জেকিল তিনি হাইড'। অন্য বিরোধীরা নিজেদের ঘর উজাড় করে মানুষের ঘর নতুন করে বানাতে চান। আমার ধারণা তাঁরাই জিতবেন। জেকিল আর হাইডরা নিজের স্বার্থ আর পিঠ বাঁচানোর লড়াইয়ে রাজনৈতিক খেলায় মেতে থাকেন। যা জনগণ বিরোধী। রাজ্যের মানুষ সে নোংরা খেলার বিরুদ্ধে জবাব দেন কিনা সেটাই দেখার। সমীক্ষা বলছে, এবারের ভোটে বিজেপির অনুকূলে চমক আসছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায়। তবে এর মধ্যে 'চমকপ্রদ চমক' কেবল পশ্চিমবঙ্গে। □

পশ্চিমবঙ্গের জন্যও মোদীর গ্যারান্টি

মোদী বিরোধীষু দিদি,

ভোটের ফল বের হলে বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গ কী বলল। তবে দেশ বলে দিয়েছে মোদীই ফিরছেন। শক্তি বাড়িয়ে ফিরছেন। তবে দিদি আপনার চিন্তা নেই। মোদী কেন্দ্রে ফিরলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের বিষয়েও কী কী করবেন তার গ্যারান্টি দিয়ে রেখেছেন। কী কী হতে পারে?

বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি মনে করেন, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিশ্রমী মানুষ থাকা সত্ত্বেও সব থেকে দুঃখজনক বাস্তব হলো, পূর্ব ভারত তার ক্ষমতা অনুযায়ী সাফল্য পায়নি। ১৯৪৭ সালে দেশের শিল্প উৎপাদনের একটা বড়ো ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসত। তার পরে একের পর এক সরকারের আমলে তা ক্রমশ কমেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে যে সমস্যা বাসা বেঁধেছে, পশ্চিমবঙ্গ তার উপসর্গ।

দিদি, আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যার প্রথমটি উন্নয়ন বিরোধী রাজনীতি। যে দিকে মোদীকে নজর দিতে হবে। তিনি দেবেনও। শিল্পায়নে যে দুর্দান্ত ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের ছিল, তা আজ আর নেই। তৃণমূল জমানাতেও সেই ধারা চলেছে। ব্যবসায় রাজনীতি- হীন সহজ পরিবেশ চাই। পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর অভাবও মেটাতে হবে। আর্থিক বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের জোগান জরুরি। পশ্চিম ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই ফারাক থেকে যাওয়াটা যথেষ্ট চিন্তার কারণ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলের প্রচুর উন্নতির সুযোগ থাকলেও তা হয়নি। আপনার আমলে পরিকল্পনা হয়েছে, প্রকল্প হয়েছে, বরাদ্দ টাকা চুরি হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কী হয়েছে দিদি? আপনিই ভালো বলতে পারেন।

বাম জমানার ৩৪ বছরের মতো এখনও শিল্পায়ন, বিনিয়োগের গতিরোধ হয়েছে। এমনকী, আজকের দিনেও আপনার দলের মন্ত্রীদের মধ্যে রাজ্যের আর্থিক উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। বিহারেও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। মেগা ফুড পার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যাধুনিক শিল্প তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যের এত কৃষিজ সম্পদ থাকলেও সেটা করা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামো নির্মাণে বড়ো পদক্ষেপ করেছে। বিভিন্ন শিল্প করিডোর গড়ে তোলা হয়েছে। আর্থিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, রপ্তানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই করিডোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই করিডোরগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করবে। ফলে বিনিয়োগ বাড়বে। আর্থিক উন্নয়ন হবে। কিন্তু সেই পরিবেশও তো তৈরি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হলেও রাজ্যের জন্য কাজের কাজটাই হচ্ছে না।

আপনি যা যা করেন সবই ভোটের দিকে তাকিয়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে ভোট কিনতে চান। আবার কৃষক ভাতা দিয়েও। কিন্তু পরিকাঠামো না দিলে কেউ কোনোদিন স্বনির্ভর হতে পারবে না। ফলে ভাতা-নির্ভর হয়েই থাকতে হবে।

কেন্দ্র চায় কৃষি, মৎস্য, বস্ত্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হোক। কিন্তু আপনি যা যা করেন সবই ভোটের দিকে তাকিয়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে ভোট কিনতে চান। আবার কৃষক ভাতা দিয়েও। কিন্তু পরিকাঠামো না দিলে কেউ কোনোদিন স্বনির্ভর হতে পারবে না। ফলে ভাতা-নির্ভর হয়ে থাকতে হবে।

তাতে অবশ্য আপনারই সুবিধা। মানুষ যদি ভাতামুখী হয়ে থাকে তবে তাঁকে চিরকাল ভোটার বানিয়ে রাখা যাবে। মায়ের মৃত্যুতেও ছেলেকে আপনার পার্টি অফিসে গিয়ে বলতে হবে সমব্যথী ভাতা দাও। দু' হাজার টাকায় মায়ের শেষকৃত্য করবে ছেলে। এই সব বলেই তো দিদি আপনি ভোট চাইছেন। পাবেনও। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন আপনার আর আপনার ভাইপোর জীবন সহজ করার জন্য জনতা আপনাকে ক্ষমতায় আনেনি। মহিলা নির্যাতন থেকে গ্রামোন্নয়ন সবই যে আপনি একই মাপদণ্ডে মাপেন। তার নাম ভোট-রাজনীতি।

এই ভোটের সময়ে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, এ রাজ্যের মানুষ কিন্তু সব বুঝতে পারছে। আপনি যতই বলুন, ভিতরে ভিতরে সবার মনেই প্রশ্ন। তাই ভয় করছে দিদি। আপনার ভবিষ্যৎ এবং এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় করছে।

অতিথি কলম

ইমতিয়াজ মেহমুদ

নিয়মিত সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্ব জুড়ে কায়েম করেছে এক আতঙ্কের রাজত্ব, তাদের সৃষ্ট জেহাদকে এক স্থায়ী যুদ্ধের রূপ দিয়েছে। বিধর্মীদের ওপর লাগাতার আক্রমণ, তাদের হত্যা, ধর্ষণ, তাদের সম্পদ লুঠের পাশাপাশি নিজেরা সর্বত্র আক্রান্ত হওয়ার নাটক করে নির্লজ্জ ভিক্টিম কার্ড খেলা জারি রাখছে ইসলামিক জেহাদিরা।

দেশে দেশে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলে ইসলামিক রণনীতি

গত ১৫০ বছরে ইওরোপে বামপন্থার সূত্রপাত হওয়ার পরবর্তী সময়কালে ইওরোপ জুড়ে বামপন্থী ক্রিয়াকলাপের অনুরূপেই বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে ইসলাম। পুরোপুরি বামপন্থীদের জুতোয় পা গলিয়েছে ইসলাম।

বামপন্থীরা আগেই প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলে পশ্চিম (অর্থাৎ ইওরোপ) ও ইসলামের মধ্যে ঐতিহাসিকতাহীন একটি মনগড়া, সাজানো সম্পর্কের বিবরণ প্রস্তুত করে রেখেছিল। ইসলাম বাস্তবে যে কোনো দেশ ও জাতিকে তার শিকার বানাতে দক্ষ হলেও এই বামপন্থীরা ইসলামকে পশ্চিমের শিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এই কারণে ইওরোপীয়দের মনে কাজ করে এক চাপা অপরাধবোধ।

এর ফলে পশ্চিমি লোকজন প্রথম দিকে খোলা মনে ইওরোপে আগত মুসলমানদের অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু তারপর কীরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো? যা অবস্থা তাতে এখনই কোনো পদক্ষেপ না নিলে আগামীদিনে পশ্চিমের হাল কী হবে?

ক্ষমতা দখলে ইসলামের নজর : কাফের বা বিধর্মীদের মতো শিক্ষাদীক্ষা, ক্যারিয়ার (কর্মজীবন), অর্থোপার্জন, ঘরবাড়ি বা খেলাধুলায় মুসলমানদের কোনো আগ্রহ নেই। পশ্চিমে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য হলো উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ লাভ। এছাড়াও তাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো পশ্চিমি দেশগুলির ক্ষমতা দখল। বিশ্বের প্রতিটি দেশকে কবজা করাই ইসলামের আসল লক্ষ্য।

কোরানের ৮.৩৯ ও ৯.২৯ আয়াত অনুযায়ী এই কাজ করার জন্য তারা আল্লার আদেশপ্রাপ্ত। কোরানের ৯.১২০, ৯.১৪ ও ৯.১৫ আয়াত অনুযায়ী কাফেরদের সঙ্গে করা যে কোনো ধরনের কাজ উচিত ও ন্যায়সঙ্গত। তাদের হাতে হওয়া কাফেরদের সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি, তা নাকি আল্লার দ্বারা ইমানিদের মাধ্যমে কাফেরদের ওপর প্রযুক্ত দণ্ড। কোরানের ৬০.৪, ৫৮.২২, ৪.৮৯, ৪.১৪৪, ৫.৫১, ৫.৫৪, ৬.৪০, ৯.২৩ ও ৬০.১ আয়াত (আল বারার মত) অনুযায়ী কাফেররা তাদের সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, কাফেরদের ঘৃণা করার জন্য আল্লা ইমানিদের নির্দেশ দিয়েছেন।

কোরানের ৪.১৪৪ আয়াতে ইমানিদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়েছে আল্লার সতর্কবাণী। কাফেরদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ইমানিদের মিলবে কড়া দণ্ড। মুসলমানরা কোরানের এই সবকিছুই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। মুসলমান সমাজের নিয়ন্ত্রক মৌলভিদের মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কোরান, আর এই মৌলভিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সাধারণ মুসলমানদের মস্তিষ্ক।

মুসলমানদের মানসিক স্তরে নীতি-নৈতিকতা বোধের বিকাশের জন্য, তাদের মধ্যে পরিণত চেতনা সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় দিশানির্দেশ দানের অনুমতিটাই নেই। এই ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো বিকল্প পথও খোলা নেই। জেহাদে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মুসলমানকে আহ্বানের পর সে তা প্রত্যাখ্যান করলে তাকে হত্যা করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে আমেরিকার তরফে সব রকমের সহায়তা বর্ষিত হলেও আফগানিস্তানের মতো দেশে লোকজন কেন আমেরিকার বদলে বেছে নেয় তালিবানকে। কোনো মুসলমান এই ব্যবস্থার সংস্কার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করলে, ধর্মীয় নির্দেশ মেনে তাকে হত্যাই করা হবে।

পাকিস্তানি রাজনীতিক সলমন তাসির পাকিস্তানের ভয়ংকর ব্লাসফেমি আইনের বিরোধিতায় সোচ্চার হলে তারই দেহরক্ষী তাকে হত্যা করে। এমতাবস্থায়, পশ্চিম (ইওরোপ-আমেরিকা) যদি মনে করে তাদের সমৃদ্ধি ও উদারতা উপরোক্ত ব্যাপারগুলির কোনোরকম পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, তো তাদের সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। উদারতার জবাব তারা পাবে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই। পশ্চিমি কাফেরদের মনে এবার আতঙ্ক সৃষ্টি করবে ইসলাম।

পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার এসকে মালিক তার লেখা 'দ্য কুরানিক কনসেপ্ট অফ ওয়ার' বইতে লিখেছেন— কাফেরদের সমর্পণ বা বশ্যতা স্বীকার করানোর উদ্দেশ্যেই সন্ত্রাস ছড়ানো হয়ে থাকে। ইসলামের শত্রুদের

ওপর ইসলামিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যম নয় সন্ত্রাসবাদ বা জেহাদ। জেহাদই হলো সেই সিদ্ধান্ত যা আমরা আমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফেরদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই।

তফসির ইবন্ অজিবা— কোরানের ৯:২৯ আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী--- 'জিম্মিদের (অর্থাৎ ইসলামি দেশের অমুসলিম নাগরিকদের) নিজেদের আত্মা, সৌভাগ্য ও যাবতীয় ইচ্ছাকে বলি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো জীবনের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা, তাদের নেতৃত্ব এবং তাদের সম্মানকে মেরে ফেলা উচিত। জিম্মিদের আত্মাকে চাহিদাহীন, লালসাহীন করে ফেলতে হবে, তাদের ওপর দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা পুরোপুরি মাথা নীচু করে বাঁচতে বাধ্য হয়। এইসবের পর তাদের কাছে কোনো কিছুই আর অসহনীয় মনে হবে না। তারা শাসকের (ইসলামের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষমতা হারাবে। দারিদ্র্য অথবা প্রাচুর্য তার কাছে হবে সমান। মান-অপমান বোধের কোনো পার্থক্য তার কাছে থাকবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আর সেই অন্যায়কে মেনে নেওয়া তাদের কাছে একই হবে। সব পাওয়া এবং সব হারানো তাদের কাছে একই দাঁড়াবে। এই সমস্ত বোধগুলি তাদের কাছে যখন সমান বা একই রকম হয়ে যাবে, তখন জিম্মিরা মান-সম্মানহীন, আত্মমর্যাদাহীনে পরিণত হবে, এবং সেই সব কিছু স্বেচ্ছায় সমর্পণ করবে যা তাদের করা উচিত'।

এই আহমদ ইবন্ মুহম্মদ ইবন্ অজিবার ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুনিয়া জুড়ে ইসলামের অনুগামীরা কাফেরদের নিঃশেষ করার লক্ষ্যে সক্রিয়। মুসলমানদের ধনসম্পদ ও দাস-দাসী সরবরাহ করার ওপরেই নির্ভর করবে কাফেরদের অস্তিত্ব। ইসলাম এটা বুঝে ফেলেছে যে তাদের দ্বারা তৈরি আতঙ্কের এই সাম্রাজ্য, তাদের এই সন্ত্রাস মানুষের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলে। আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত মানুষজনের সেই অনুভূতি থাকে না যে তারা ক্রমশ মনুষ্য চেতনারহিত হয়ে পড়ছেন। এর ফলে তারা অবশেষে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় এবং

জেহাদকে কোনো নিরবচ্ছিন্ন লড়াই নয়, কিন্তু যুদ্ধেরই একটি স্থায়ী স্থিতি বা একটি চিরস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।'

ইসলামের চাপিয়ে দেওয়া বোঝা বইতে থাকা পশুতে পরিণত হয়।

এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রথম থেকেই মুসলমান তোষণ শুরু করে দেয়, কারণ শুধু বেঁচে থাকার চিন্তাটাই তখন তাদের মাথায় ঘোরে। তাদের মুখে অনবরত ঘুরতে থাকে ইসলামের প্রশংসা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের (ইসলামের চোখে তাদের অনুগত, তোষণকারীদের সঙ্গী বিধর্মী) থেকে তাদের তৈরি হয় দূরত্ব। তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, তাদের মধ্যে সামাজিক মেলবন্ধন, আত্মিক সংযোগ হারিয়ে যেতে থাকে। এই ইসলাম তোষণকারী লোকজন তখন বিশ্বাসভাজন থাকে না। তারা হয়ে ওঠে চতুর, অতিরিক্ত চালাক এবং অবিশ্বাসের পাত্র। লজ্জাশরম হারিয়ে তারা হয়ে ওঠে নির্লজ্জ।

এই সব ফলাফল ও পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত জেনেই ইসলামের উদ্দেশ্য কাফেরদের (বিধর্মীদের) হৃদয়ে-মনে ভীতি ও আতঙ্কের বীজ বপন। মাজিদ খাদ্দুরির মত অনুসারে, 'যদি ইসলামের কাছে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী না থাকে, তখন ইসলামের ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায় বর্তায় ইমানসম্পন্নদের ওপরেই। সরাসরি যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক যে কোনো কৌশল এই ইমানিরা সেই ক্ষেত্রে নিতে পারে। এই কারণে জেহাদকে কোনো নিরবচ্ছিন্ন লড়াই নয়, কিন্তু যুদ্ধেরই একটি স্থায়ী স্থিতি বা একটি চিরস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।'

নিয়মিত সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্ব জুড়ে কায়েম করেছে এক আতঙ্কের রাজত্ব, তাদের সৃষ্ট জেহাদকে এক স্থায়ী যুদ্ধের রূপ দিয়েছে। বিধর্মীদের ওপর লাগাতার আক্রমণ, তাদের হত্যা, ধর্ষণ, তাদের সম্পদ লুঠের পাশাপাশি নিজেরা সর্বত্র আক্রান্ত হওয়ার নাটক করে নির্লজ্জ ভিক্টিম কার্ড খেলা জারি রাখছে ইসলামিক জেহাদিরা। তাদের সঙ্গে জেহাদিরা ঘৃণ্য আচরণ এবং তাদের ওপর সব রকম আক্রমণ জারি রাখলেও তার প্রতিক্রিয়ায় কাফেররা যাতে সরব হতে না পারে তার জন্যেই জেহাদিদের তরফে গৃহীত হয়েছে এই রণকৌশল।

ইবন্ আল-মুনির (মৃত্যু : ১৩৩৩ সাল) লেখা অনুযায়ী, 'যুদ্ধ হলো একটি ছল, যার প্রয়োগের মাধ্যমে এক ধর্মোন্মাদ যোদ্ধার দ্বারা ঘোষিত ও পরিচালিত পরিপূর্ণ যুদ্ধ— পুরোপুরিভাবে ধোঁকা বা প্রতারণার দ্বারা চালিত। এই যুদ্ধ কোনো সম্মুখ সংঘাত নয়। উত্তর দিকে নিহিত বিপদ সমূহ এবং সেই অন্তর্নিহিত বা লুকিয়ে থাকা বিপদের সম্ভাবনার কারণে মুখোমুখি সংঘাত এই যুদ্ধের মাধ্যম নয়, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ক্ষতি এড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণার দ্বারা এই যুদ্ধ জয়ে সক্ষম। সম্মুখ সমর কার্যকরী নয় বিশেষ করে যখন তার নিজের ও সঙ্গীদের কোনো রকম ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই সেই যোদ্ধার দ্বারা যুদ্ধ জয় সম্ভব।'

ইবন্ হজর (মৃত্যু : ১৪৪৮ সাল) মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, 'যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যুদ্ধ চলাকালীন কাফেরদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য, সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পুরোপুরি বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিনয় এবং তার পরিণামে বিলাপ করে যেতে হবে। কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার এই সাজানো নাটকের চিত্রনাট্যের অন্যতম অংশ হবে নিজেদের তরফে সব হারানোর নকল শোক ও দুঃখ প্রকাশ'।

(লেখক ইংল্যান্ডবাসী একজন সমাজচিন্তক)

তৃতীয় দফার লক্ষ্যে এখনই অবিচল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

লোকসভা ভোটের চতুর্থ দফা সবে শেষ হয়েছে। এখনো তিন দফা বাকি। যেখানে বিরোধীরা প্রার্থী বাছাই করতেই হিমশিম খাচ্ছে বা নির্বাচনী প্রচারের অ্যাজেন্ডা ঠিক করতেই কাহিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী পাঁচ বছরে তাঁর লক্ষ্যের কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই ফলাফল প্রকাশের আগেই কেন পরের পরিকল্পনা? এটা কী ওভার কনফিডেন্স নাকি বিরোধীদের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে আত্মপ্রত্যয়? মোদী আগেই জানিয়েছেন, গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি দেখেছেন, ভোটের সময় সরকারি আমলারা ডিউটিতে চলে যান, ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। তাই তিনি ভোটের আগে থেকেই আধিকারিকদের কাজ ঠিক করে দিতেন। মোদী দাবি করেন, 'আমি আমলাদের কাজ নির্ধারণ করে দিয়ে বলি, এটা পরবর্তী সরকারের জন্য করবেন। তাই আমি অন্তত একশো দিনের পরিকল্পনা আগে থেকে করে রাখি।' এই ফর্মুলার প্রয়োগ তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ও করে চলছেন বলে মোদীর দাবি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মোদীর দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ দেশের সরকারের দৃষ্টিকোণ— নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল হবে না, কারণ এই দৃষ্টিকোণই দেশের উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পথ।

এখন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন চলছে। কিন্তু ২০৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তর পরিকল্পনা রচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিপূর্বে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই পরিকল্পনার কথা জানিয়েও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি বারবার বলেছেন, 'ট্রেলার' দেখানোর কথা। তবে সেই ট্রেলারে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই বলেই সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব, দেশের স্বার্থেই যা করার করবেন তিনি।

তিনি বলেন, 'আমি যখন কোনও বড়ো পরিকল্পনার কথা বলব, তখন কারোর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি কাউকে ভয় দেখানোর জন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। আমি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই সিদ্ধান্ত নিই। আমি মনে করি না যে আমি সব কাজ করে ফেলেছি, আমি শুধু চেষ্টা করেছি। এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে।' তিনি এও জানান, সব পরিবারের স্বপ্ন সত্যি করাই তাঁর লক্ষ্য, তাই ট্রেলারের কথা বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, ২০৪৭ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতার একশো বছর পূর্তির কথা মাথায় রেখে গত দুই বছর ধরে নিজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন তিনি। তার জন্য দেশের সবস্তরের মানুষের থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। অন্তত পনেরো লক্ষ মানুষ তাঁদের মতামতও জানিয়েছেন। এর জন্য বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও), বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগও করেছেন মোদী। এর জন্য সরকার আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের (এআই) সাহায্য নিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের তরফে নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর সরকারের ভিশন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। মোদী উত্তরে বলেন, '২০১৪ সালে আমরা যখন সরকারে আসি, আমাদের নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে অতীতের ভুলগুলি সংশোধন করতে হবে এবং দেশের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করতে হবে। দরিদ্র হোক বা কৃষক বা ব্যাংকিং সেক্টর বা অর্থনীতি, এদের প্রত্যেকেই গভীর সমস্যায় পড়েছিল।' এরই সঙ্গে দরিদ্রদের উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই মোদী বলেন, 'একাদিকে আমরা দরিদ্রদের কাছে শৌচাগার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মতো মৌলিক বিষয়গুলি পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং অন্যদিকে, আমরা একাধিক সংস্কারের মাধ্যমে খাদের ধার থেকে আমাদের অর্থনীতিকেও উদ্ধার করেছি।' ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলির সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে দৌড়চ্ছে। দেশ বর্তমানে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি, দাবি করে মোদী বলেন, 'আমাদের দেশ কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছে এবং সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদে এনডিএ সরকারের দ্বারা সংস্কারের কারণে, অনেক সেক্টর তা স্টার্ট-আপ হোক বা যে কোনো প্রকল্প, নিজস্ব প্রাণ ফিরে পেয়েছে।'

মোদী সরকারের দ্বিতীয় সময়কালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি-সহ একাধিক বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই দিক থেকে মোদী তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে কী বলছেন? মোদী বলেন, 'দ্বিতীয় মেয়াদে, মানুষ দেখেছেন ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। সেটা জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখে অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক বা কোভিড-১৯-এর সফল ব্যবস্থাপনা বা বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন ও ওষুধ পাঠানো বা মহামারী পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থায় পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য, এমন বহু উন্নয়ন ভারতের মানুষকে দেওয়া হয়েছে, আর তার ফলে দেশের মানুষের নিজের ওপর ও দেশের ভবিষ্যতের উপর আস্থা বেড়েছে।' অতঃপর সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড়ো 'থিম' কী হতে চলেছে? মোদী বলেন, 'আমাদের তৃতীয় মেয়াদের বড়ো থিম এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সেক্টরগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে অগ্রগতি প্রদান করা।'

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আগামী মেয়াদকালের জন্য তাঁরা কতটা তৈরি? মোদীর বক্তব্য, 'আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সরকারের প্রথম ১০০ দিনের পরিকল্পনা, আমরা অনেক লক্ষ্য নিয়ে তৈরি এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'অনেক কিছু করা দরকার এবং করা হবে। এটি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়কাল হতে চলেছে।' □

একুশের ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস ছিল রাজনৈতিক মোড়কে হিন্দু-গণহত্যা

রামব্রহ্ম দেবশর্মা

রাজ্যের শাসকদলটি যে আদ্যন্ত হিন্দু বিরোধী, একুশের ভোট-পরবর্তী-সন্ত্রাসই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাগ কখনোই তুলতে পারবে না শাসকদল। তিন বছর অতিক্রান্ত হলো নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খেলা। ২ মে ২০২১-এ যে 'খেলা'র সূত্রপাত হয়েছিল, ভয়ংকর খেলা, তা রাজনৈতিক মোকাবিলার নামে হিন্দু-গণহত্যা। প্রবল সন্ত্রাসের মাধ্যমে সেই পর্বে বিজেপি কর্মীদের সমস্ত মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আসর জমিয়ে ফেলেছিল শাসক দলের উন্মত্ত গুন্ডাবাহিনী। শাসক দল অবাধে লেলিয়ে দিয়েছিল জেহাদি গুন্ডাদের, যাদের একমাত্র পরিচয় 'হিন্দু বিদ্বেষ'। ভোটের গরম থাকতেই বুদ্ধিজীবীরা এটাকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলে চুপ করে ছিলেন। বিজেপি-র উপর এমন আক্রমণ তো কতই হয়! কিন্তু এ আবহে শাসকদলের হিন্দু বিদ্বেষী চরিত্রটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ভোটের কৌশলও অঙ্কের মতো নিঁখুত খেলা! একে 'দাঙ্গা' বলা যাবে না। কারণ দাঙ্গাতে উভয়ে উভয়কে মারে। এটা ছিল আসলে 'একপক্ষীয় দাঙ্গা'। 'রাজনৈতিক নির্যাতন' বলে গুলিয়ে দিলে চলবে না। বরং সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যে এটা সরাসরি হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও 'সাম্প্রদায়িক গণহত্যা'-ই বটে!

২ মে, ২০২১ থেকে যে 'খেলা' শুরু করেছিল শাসক দল এবং তারপরও নানান অছিলায় চালিয়ে গিয়েছিল, তা সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরও আড়ে-বহরে বাড়তে পারে, যদি 'মার খাওয়া দল' সচেতন না হয়। যদি সুবিধাবাদী ভোটার, রাজ্যের 'আধা সেকুলার' মানুষ, সবকিছুতেই 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' খুঁজে না বেড়ায়।

বিগত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে উন্মত্ততার একটা কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু জনসমাজই ছিল সেই আক্রমণের মূল লক্ষ্য। মোটেই সাদামাটা রাজনৈতিক সংঘাত নয়। দুটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াই নয়। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোড়কে নিজেরই পড়শির দ্বারা সংঘটিত হত্যালীলা, হিন্দু বিদ্বেষ। আড়েবহরে এ এক 'সাম্প্রদায়িক কসাইখানা' যেন। রাষ্ট্রবাদী বিচারধারাকে পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে চিরতরে মুছে দিতে বধ্যভূমি রচনার কাজ বলা যায়। অত্যাচার, লাঞ্ছনা, জুলুম, জরিমানা, ধর্ষণ আর ধ্বংসের করুণ কাহিনি বলা যায়। আর তৃণমূল কংগ্রেসের ভাষায় বলা যায় 'খেলা'। ঘরভাঙার খেলা। রাজ্যকে বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার খেলা। যে খেলা দেখতে বাঙ্গালি হিন্দু অভ্যস্ত। আগেও অসংখ্যবার দেখেছে। নিজের প্রাণ আর ধর্ম বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি হিন্দু

হিন্দু বলে নিজেরা গর্বিত হওয়ার মধ্যে কোনো পাপ নেই। হিন্দু অস্মিতার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না।

সীমানা পেরিয়ে অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে ভারতবর্ষে শরণার্থী হয়েছে। অনেকটা সেই ধরনের খেলা। তবে এগুলো এক একটা ট্রায়াল। দেখে নেওয়া, বাঙ্গালি হিন্দুকে সহজে থামানো যায় কিনা। প্রতিরোধ না হলেই নেমে আসবে আরও গাঢ় অন্ধকার। অভিজ্ঞজনের মতে, কোনো হিন্দুই এই আঁচ থেকে রেহাই পাবে না।

তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের হিন্দু ভোটাররা যদি ভাবেন এটা কেবলমাত্র বিজেপির উপর আক্রমণ, অতএব আমরা ছাড় পাবো! আমরা বরং 'No Vote to BJP'-র লোক, এই সন্ত্রাসকে সেলিব্রেট করি, হালাল মাংস কিনে 'রোববার' পালন করি! তাহলে কিন্তু আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন! নগরে আগুন লাগলে দেবালয় কখনও রক্ষা পায় না। ২১-এর ২ মে'র পর পশ্চিমবঙ্গে যা হয়েছে তা একদিন আপনার ওপরও নেমে আসবে, প্রস্তুত থাকুন। রামনবমী, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি নানান অবসরে যে কদর্যতা নিয়মিত নামিয়ে এনেছে আপনার পড়শি ভাইয়েরা এবং 'ডবল ডিমের-ওমলেট তাত্ত্বিকরা', তাতে হিমশৈলের চূড়া দেখা যাচ্ছে মাত্র! ওরা পরখ করতে চাইছে, আপনি কত বড়ো 'সেকুলার', কত বড়ো উদাসীন! সেদিন আপনার কিছুই করার থাকবে না। কারণ আপনি অতীতে কোনো হিন্দুর পাশে থাকেননি, হিন্দুর পাশে থাকেন না। এটাই আপনার প্রগতিশীল-প্রকাশ। হিন্দুধর্ম পালনকারীদের আপনি 'সাম্প্রদায়িক' বলে মনে করেন। হিন্দুর পরাজয়ে, হিন্দু রাজনৈতিক কর্মী খুনে হৃদয় ব্যথিত হয় না। আপনার 'হিন্দুত্ব কবেই মরে ভূত' হয়ে গেছে।

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা

ফঃ ২

হয়েছিল 'মহামৃত্যু কী?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্ম-বিস্মৃতি'। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্ম-বিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয়। 'পুব থেকে পশ্চিমে'। আরও পশ্চিমে দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো নিজের গ্রামটি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়ের শরীর হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি সেদিনই রেহাই পাবে, যেদিন যাবতীয় জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না আপনাকে। 'সম্প্রীতির আলিঙ্গন'-এও প্রতিবেশীর সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখবেন যেদিন! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা সেদিন থেকেই শুরু হবে।

আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়াগুলি সেই সমস্ত জঘন্য ঘটনার সংবাদ দেয়নি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল চুপ। বুদ্ধিজীবীর মুখে কুলুপ। প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে ওঠার রাস্তা বন্ধ। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে খানিক আভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র, বাস্তবের পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়ংকর।

ভোট তো সারা দেশেই হয়, নানান রাজ্যে হয়। কিন্তু এ রাজ্যের মতো রাজনৈতিক হিংসা কোথাও হয় না। ২০১৮ সালে হত্যালীলার পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হতে দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রক্তে-শোকে- সন্তাপে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে একুশের ভোট। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য জুড়ে বিজেপির রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং রাষ্ট্রবাদী সাধারণ মানুষের উপর নেমে এলো ভয়ংকর আক্রমণ। কোনো সভ্য দেশে এটা কল্পনা করাও যায় না। আক্রমণের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রবাদী বাঙ্গালি হিন্দু। কোন বাড়ি ভাঙা হবে, কোন নারী ধর্ষিতা হবেন, ধর্ম দেখে দেখে চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল শাসকের দালাল হিন্দুরা। এই দুঃখ কোথায় রাখবো! বিধর্মী হার্মাদদের দিয়ে রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। প্রবণতাটি যদি না জানতে পারি, আক্রমণকারী কারা তার পরিচয় যদি না জানতে পারি, তবে এই পশ্চিমবঙ্গের কোনো দলের কোনো রাজনৈতিক হিন্দু নেতা-কর্মীই কিন্তু আগামী দিনে সুরক্ষিত থাকবেন না। এটা হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা। রবীন্দ্রনাথের কথায়— 'আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে।'

হিন্দুরা সমাজের উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতে চায় না। কিন্তু পরিসংখ্যান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যারা নিধন হয়েছেন ভোট সন্ত্রাসে তাদের অনেকেই সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব, আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির সন্তান। তারা 'ব্রাত্যজন', তারা 'জনজাতি', তারা 'অন্তেবাসী প্রান্তবাসী'। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় মানুষের উপরে টার্গেট করেছে এই হিংস্রতা। হিন্দু উচ্চ-নীচ কেউ বাদ পড়েনি। এর কি কোনো বিচার হবে না? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে?

অন্য রাজ্যের মানুষ এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে চর্চা করেছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বিচার চেয়েছেন। কিন্তু এ রাজ্যে ভুক্তভোগী ছাড়া, রাজনৈতিক কর্মী সমর্থক ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তা জানতে পারেননি। আমরা কেন প্রশ্ন করবো না শীতলকুচির ওই তপশিলি মিন্টু বর্মন, জগদ্দলের ওই তপশিলি শোভারানি মণ্ডল, বিনপুরের জনজাতি কিশোর মান্ডি, ডায়মন্ড হারবারের ওবিসি অরিন্দম মিদ্দে— আমার রক্ত, আমার ভাই! এটা রাজনৈতিক চাদরের আড়ালে 'পরিকল্পিত সাম্প্রাদায়িক জিঘাংসা'। একদল জেহাদি মানুষকে দিয়ে অন্য সমাজের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার খেলা। তা লঘু করে দেখলে কিন্তু চলবে না।

অনেকদিন ধরেই আমরা 'ল্যান্ড-জেহাদ', 'লাভ-জেহাদ' ইত্যাদি কথাগুলি শুনে আসছি। সীমান্তবর্তী গ্রামে ক্রমাগত জেহাদিদের সংঘটিত জোরদারির মুখে শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের জমি, বসতবাড়ি বিক্রি করতে এরকম বাধ্য হয়েছে। অসতর্ক সেকুলার হিন্দু পরিবারের মেয়েটিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে তাকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবন সুখের হচ্ছে না। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে সেই সন্ত্রাসের একটি নয়া পদ্ধতি হলো হিন্দু কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া। বাম আমলে ভূমি সংস্কারের নামে অনেক কৃষক জমি চাষ করার সুযোগ লাভ করেছিল। কিন্তু তারা সকলে জমির পাট্টা পাননি। ফলে তাদের জমির স্বত্বে তারা অফিসিয়ালি নথিভুক্ত ও অধিকারভুক্ত হননি। এই অবস্থায় দেখা গেছে রাষ্ট্রবাদী শক্তির সঙ্গে থাকা কৃষকের জমি সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিচ্ছে। তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা দাবি করছে পুনরায় চাষের অনুমতি লাভ করার জন্য। সমস্যা থেকে বাঁচতে কৃষক বর্তমান শাসকদলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এই জোরজবরদস্তি থেকে মুক্তির পথ কোথায়? হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না?

পারবে যদি হিন্দুরা সংগঠিত হতে পারে। প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা হিন্দুরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী। তিনি বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে 'সেবা' আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে এ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনকে অংশ নিতে হবে। ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে। মাতৃশক্তির মহাজাগরণ করাতে হবে। হিন্দু বলে নিজেরা গর্বিত হওয়ার মধ্যে কোনো পাপ নেই। হিন্দু অস্মিতার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। কিন্তু সবার আগে হিন্দুদের ওপর সংঘটিত জিঘাংসার দলিল পাতায় পাতায় লিখে যেতে হবে আমাদের। □

রাজ্যপালকে জড়িয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক
আঘাতটা সংবিধানের ওপরেই

বিমল শঙ্কর নন্দ

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যে সংবিধান ভারতীয় জনগণের হাতে তুলে দিয়ে তাকে কার্যকরী করা হয় বহু ঝড়ঝাপটা সামলে তা আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সমস্ত দেশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের অধিকাংশই অচিরে ভয়ংকর একনায়কতন্ত্রের দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়ে। যে গুটিকয় দেশ ব্যতিক্রম তার অন্যতম আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। ভারতের মতো দেশে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়েছে কারণ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভারতে গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক হলো ভারতীয় জনগণ। দেশের জনগণ যদি গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন হয় তবে গণতন্ত্রের ভিত্তি অনেক শক্তিশালী হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা জারি করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভেবেছিলেন তিনিই হবেন ভারতীয় রাজনীতির অগ্রগতির চূড়ান্ত নির্ধারক। কিন্তু ২১ মার্চ ১৯৭৭-এ তিনিই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নির্বাচনে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে ভারতের জনগণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝিয়ে দেয় যে ভারতীয় রাজনীতির গতি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত নির্ধারক তিনি নন। ভারতীয় রাজনীতি কোন পথে এগোবে তা স্থির করবে দেশের জনসাধারণ।

পঞ্চম লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে ৩৫২টি আসন পাওয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ১৫৪টি আসন পায়। আর সদ্যগঠিত জনতা পার্টি পায় ২৯৫টি আসন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রায়বেরিলি কেন্দ্রে হেরে যান। মনে রাখতে হবে তখন ভারতের জনসংখ্যার মাত্র চল্লিশ শতাংশ মানুষ ছিল সাক্ষর। টেলিভিশন সদ্য এদেশে তার সম্প্রচার শুরু করেছে। সামাজিক গণমাধ্যমের কোনো ভাবনাই তখন গড়ে ওঠেনি। অল্প কিছু মানুষের বাড়িতে টেলিফোন থাকতো। একদিন মোবাইল ফোন মানুষের হাতে হাতে ঘুরবে সেটা কারও চিন্তার মধ্যেও ছিল না। এখনকার তুলনায় প্রায় আদিম যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই যুগে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। গোটা বিশ্ব সবিস্ময়ে ভারতীয় জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে লক্ষ্য করেছিল এবং কুর্নিশ জানিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল ভারতে গণতন্ত্রের ওপর কোনো আঘাত এলে তা প্রতিরোধ করবে ভারতের জনগণ এবং তাদের হাতে অস্ত্র হলো বেশ কিছু সংবিধান প্রদত্ত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে জড়িয়ে সাম্প্রতিক যে বিতর্ক উঠেছে কিংবা বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে তা আলোচনা করতে গিয়ে উপক্রমণিকা হিসেবে ভারতীয় সংবিধানকে নিয়ে এই আলোচনা করতেই হলো কারণ রাজ্যের রাজ্যপাল একটি সাংবিধানিক পদ অলংকৃত করেন। ব্রিটেনে ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলকে অনুসরণ করে ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার

প্রচলন ঘটিয়েছে ভারতের সংবিধান। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ভারতের সাংবিধানিক প্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতত্বে মন্ত্রীপরিষদের হাতে ন্যস্ত। অঙ্গ-রাজ্যগুলিতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন রাজ্যপাল। আর দৈনন্দিন রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা, আইন রূপায়ণ প্রভৃতির দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার হাতেই ন্যস্ত। যেহেতু রাজ্যপাল একজন সাংবিধানিক প্রধান তাই রাজ্যপালকে নিয়ে কোনো বিতর্ক উঠলে কিংবা বিতর্ক তৈরি করা হলে সাংবিধানিক ব্যবস্থাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

রাজ্যপালদের নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আগেও উঠেছে। বিশেষত কেন্দ্র ও রাজ্যে যদি দুটি আলাদা দলের সরকার থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, তাও আবার রাজভবনের এক মহিলা কর্মীকে, অবশ্যই বিরল। কারণ রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করা হয় অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক মানুষদের। তাঁরা হয় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ কিংবা অবসরপ্রাপ্ত আমলা অথবা বিভিন্ন পেশার সফল মানুষজন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার। তাই সবদিক দিয়েই এই অভিযোগের গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য বিচার করা দরকার।

প্রসঙ্গত, এই অভিযোগ সত্য কী মিথ্যা তা বিচার করার জায়গা এই নিবন্ধে নয়। সেগুলি প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু এই অভিযোগকে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং লোকসভা নির্বাচনের সময় এখান থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে তা অবশ্যই উদ্বেগের।

রাজভবনের একজন চুক্তিভিত্তিক মহিলাকর্মী মে মাসের ২ তারিখে অভিযোগ করেন যে এ রাজ্যের রাজ্যপাল নাকি দুবার তাঁর শ্লীলতাহানি করেছেন। একবার গতমাসে অর্থাৎ এপ্রিলের ২৪ তারিখে এবং দ্বিতীয়বার এমাস অর্থাৎ মে মাসের ২ তারিখে। এই অভিযোগ সত্য কী মিথ্যা সেটা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু কিছু প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং উঠছেও। ২৪ এপ্রিল প্রথম ঘটনা (যদি আদৌ ঘটে থাকে) ঘটার পর অভিযোগ জানানো হলো না কেন? যদি সত্যিই ২৪ এপ্রিল এই মারাত্মক ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে অভিযোগকারিণী আবার ২ মে সাক্ষাৎ করতে গেলেন কেন? তদন্তে এই প্রশ্ন উঠবেই এবং অভিযোগকারিণীকে তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে। বিশেষত ২ মে যখন এই অভিযোগ করা হচ্ছে তার কিছুক্ষণ পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজভবনে আসার এবং রাজ্যপালের আতিথেয়তা গ্রহণের কথা ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি যাঁকে নিরাপত্তা দেয় স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ তারা প্রধানমন্ত্রীর সফরস্থানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। সেদিন রাজ্যপালও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ত থাকার কথা। তার মধ্যেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেল? এই প্রশ্নগুলো উঠবেই। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল গত ৯ মে, ২০২৪ তারিখে বাছাই করা কিছু মানুষকে ২ মে'র সিসিটিভি ফুটেজের কিছু অংশ দেখিয়েছেন। তাতে অবশ্য বিতর্ক থামছে না কিংবা বলা ভালো থামতে দেওয়া হচ্ছে না।

সংবিধানের ৩৬১নং ধারা অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। কিংবা তাঁদের গ্রেপ্তার করা যায় না। তাঁরা যতদিন এই পদে থাকেন ততদিন তাঁরা এই ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা ভোগ করেন। কিন্তু যারা এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চায় তাদের মুখ বন্ধ করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গে সীমাহীন দুর্নীতি, স্কুল শিক্ষকদের চাকরি বিক্রির কেলেঙ্কারি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের অভিযোগ প্রভৃতি কারণে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে অত্যন্ত কোণঠাসা অবস্থায় আছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জনমত সমীক্ষক গোষ্ঠী ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। লোকসভা ভোটে বিপর্যস্ত হলে এই দলের পক্ষে রাজ্যের প্রশাসন চালানো এমনকী সরকার রক্ষাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ তৃণমূল দলটি কোনো মতাদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। সাংগঠনিক কাঠামোও ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যস্ত কিংবা মজবুত নয়। দলটা রাজ্য চালাচ্ছে একদিকে পুলিশ এবং কিছু প্রশাসকের দ্বারা, অন্যদিকে পার্টিকর্মীদের পেশীশক্তির সাহায্যে।

নির্বাচনী বিপর্যয় এদের দলীয় কাঠামোতে এবং রাজ্যপরিচালনায় বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই নির্বাচনের আগে এই অভিযোগ উঠতেই রাজ্যের শাসকদল রে রে করে মাঠে নেমে পড়েছে। বিভিন্ন সভায় এই ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। এরকম অনেক অভিযোগ নাকি দল এবং সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আগেও পেয়েছেন। নেহাত ভদ্রতা দেখিয়ে চুপ করে ছিলেন। আর তাঁরা চুপ করে থাকবেন না। পশ্চিবঙ্গের মা বোনেদের সম্মান রক্ষায় তাঁরা একেবারে জান কবুল করে দেবেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন হলো, এতদিন এই ধরনের অভিযোগ পেয়েও চুপ করে থাকার মধ্যে কতটা বাহাদুরি আছে? বরং এই ধরনের অভিযোগ পেয়েও ব্যবস্থা না নেওয়া চূড়ান্ত প্রশাসনিক অপদার্থতার নজির। ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভে এরা ভুলেই গেছে যে এই ঘটনাপ্রবাহে সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার। এই ধরনের অভিযোগ উঠলে তার মোকাবিলা করতে প্রয়োজন চরম প্রশাসনিক দক্ষতার। তাতে অভিযোগ সত্যি হলে অভিযোগকারী সুবিচার পায় এবং দেশের সংবিধানও রক্ষিত হয় মর্যাদার সঙ্গে। ব্যক্তি বা দলের চেয়ে সংবিধান অনেক বড়ো। অবশ্য ক্ষমতাসর্বস্ব দুর্নীতিগ্রস্তরা কবেই-বা সংবিধানের কথা ভেবেছে! □

পশ্চিমবঙ্গে রিগিং রসায়ন

ভোটের নামে প্রহসন

দেবজিৎ সরকার

আগের দিন রাত আটটা

প্রচার পর্ব শেষ হয়েছে। বুথভিত্তিক ভয় প্রচারের পালা। দরজায় আচমকা খটখট। দরজা খুলতেই আধো আলোয় মুখ চেনা জানা দুজন, বাকি চার পাঁচজন অচেনা। এই চার-পাঁচজনের মধ্যে কারও গালে পুরানো কাটার দাগ, কারও হাত বা মুখে বারুদে পোড়ার চিহ্ন। বাড়িটি বিরোধী দলের বুথকর্মীর বাড়ি। 'মাসিমা- মেসোমশাই, বউদি, বোন সারাবছর অনেক রাজনীতি হয়েছে, কয়েকদিন অনেক মিটিং মিছিল হয়েছে, পাড়ার ছেলে ভালো থাকুক এটাই চাই, তা বলতে এলাম, সাবধানে থাকবেন, ভোট চলে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও চলে যাবে। তারপর কিন্তু এই পাড়াতেই থাকতে হবে ঠিক কিনা।'

আগের দিন রাত্রি নটা

পাড়ার পাশের মাঠে আচমকা আওয়াজ— বুম্ বুম্ বুম্! খালি লাল সাদা— জালকাঠি নেই। একটু আলো, কিছুটা ধোঁওয়া আর বিকট শব্দ। এক পিসেই কাফি। ৩৪+১৩ বছর ধরে মাথার মধ্যে শান্তির চাষ করা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালি ভোটারকে হালকা করে চাপে রাখতে ছ-সাতশো টাকার বাজে খরচাটা তো আগের রাতে করতেই হবে।

আগের দিন রাত্রি সাড়ে দশটা

ভোটকেন্দ্র। প্রিসাইডিং অফিসার-সহ বাকি ভোটকর্মীরা রাতের খাবার খাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন। পুলিশ আর আধাসামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীরা খেতে বসবেন-বসবেন করছেন। দু-একজন নতুন ভোটকর্মী অভিজ্ঞ কর্মীদের কাছ থেকে আগামীদিনের ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছেন। মহিলা ভোটকর্মীরা একটু আগে খেয়ে নিয়েছেন, এখন ফোনে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক এই সময় আচমকা চারজন মোটামুটি ভদ্রলোক গোছের আগন্তুকের আগমন। —'কী, সব ঠিক আছে তো? খাবার জল লাগবে, খাবার জল? বাথরুমগুলো সব পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে তো? সে কী করেনি? আরে কী বলছেন বাথরুম তো পরিষ্কার রাখতেই হবে। গতবারে যখন গোলমাল হলো তখন তো মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারকে টয়লেটেই লুকোতে হয়েছিল। বুঝুন ব্যাপারটা। দুটো ফলস ভোট নিয়ে ভদ্রমহিলা এমন তেরিয়া হয়েছিলেন যেন উনি স্বয়ং নির্বাচন কমিশন। তারপর হই-হই— বুঝতেই পারছেন আমাদের সমস্ত কর্মীর রাগকে তো আর কন্ট্রোল করা যায় না। তাই ওনার শাড়ি ব্লাউজ ছিড়ে গেলেও আর তো কিছু হয়নি— তারপর তো টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে উনি রিপোর্টেও লিখেছিলেন ভোট শান্তিপূর্ণ।

যাই বলুন এই যে ইস্কুল দেখছেন যেটা এখন ভোটকেন্দ্র তার টয়লেটের দরজার ছিটকিনিটা বেশ শক্তপোক্ত। নইলে যে কী হতো— ইয়ং মহিলা।

এর মধ্যে আরেকজন— 'আরে ঠিকাচ্ছে ঠিকাচ্ছে— ওঁয়ারা সরকারি কম্মচারী— সিক্ষিত মানুষ অতো বুঝাতে হবে না। আর সব দেখে গেলাম দাদা, কাল তো পার্টির হয়ে আমি থাকবো— পার্টির অসুবিধা না হলে কারোর অসুবিধা হবে না। প্রথমজন— তা ঠিক। কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে। ভোট শেষ করে সব যেন ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছায়। এলাকার একটা সম্মান আছে না। অ্যাই— বিরিয়ানি আর জলের বোতলগুলো নামিয়ে দিয়ে যা। আসি তাহলে—।'

ভোটের দিন ভোর পাঁচটা থেকে ছটা

ভোটকেন্দ্রের বাইরে দুজন পুলিশকর্মী। একশো মিটার দূরে বিভিন্ন দলের বুথ। ভোটার লিস্ট নিয়ে কাগজ কলম বাগিয়ে বিভিন্ন দলের লোকেরা বসছেন। বুথের সামনে জনাপঞ্চাশেক ভোটার। কেউ কিন্তু ভোট দিচ্ছে না। ওরা সাড়ে আটটা অবধি লাইনে দাঁড়াবে। লাইনে দাঁড়ানোটাই ওদের কাজ।

ভোটের দিন সকাল সাতটা

বিরোধী দলের অভিযোগ বুথ জ্যাম হয়েছে। স্লো পোল চলছে। প্রথম ঘণ্টায় মাত্র তেইশটা ভোট পড়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ফোন এলো--- প্রিসাইডিং অফিসার পরিস্থিতি সেক্টর অফিসারকে জানালেন। কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ি নাকি আসছে। ইতিমধ্যে একজন বয়স্ক

ভোটারকে সাহায্য করার নামে তার ভোট রাজ্য শাসক দলের এজেন্ট নিজে দিয়ে দিলেন। বিরোধী দলের এজেন্ট প্রতিবাদ করে উঠতেই শাসক দলের এজেন্ট ও দুজন নির্দল প্রার্থীর (যারা আসলে শাসক দলের ডামি ক্যান্ডিডেট) এজেন্ট কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে এনে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে চড় মারতে মারতে ভোটকেন্দ্রের বাইরে বার করে দিলেন।

প্রিসাইডিং অফিসার বন্দুকধারী আধাসামরিক বাহিনীর কর্মী, বাইরের লাঠিধারী পুলিশ— দর্শক মাত্র। মিনিট পনেরো পর থেকে বুথের ভিতরে শুরু হবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটলুঠ।

সকাল ন'টা

টেলি মিডিয়ার রিপোর্ট— 'আমরা এখন অমুক লোকসভা কেন্দ্রের অমুক বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত এতো নম্বর বুথ থেকে রিপোর্ট পেলাম সেখানে ব্যাপক অনিয়ম চলছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধির কাছ থেকে সরাসরি শুনে নেবো— অমুক বলো ওখানে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে?'

'দেখ তো অমুক, এই কেন্দ্রে অভিযোগ যে বিরোধী দলের এজেন্টকে ভুয়ো ভোট দেওয়ায় প্রতিবাদ করায় শারীরিক নিগ্রহ করে করে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব স্লোপোল চলছে এবং বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন। অনেক ভোটার বিরক্ত হয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। (ক্যামেরা ম্যান) আমরা এবারে ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ঢুকছি। দেখো অমুক ভোটের মেশিন যেখানে রাখা আছে তার পিছনেই জানালা। (ক্যামেরা জুম) খোলা জানলার ওপাশে রাস্তায় ভিড় এবং জানলার পাশের পাঁচিলে শাসক দলের দুজন কর্মীকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে খোলামেলা ভোট হচ্ছে।'

এই কি গণতন্ত্র, একি অবস্থা, কি ঠিক আছে অমুক, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমরা স্টুডিয়োর আলোচনায় ফিরছি।

সকাল ১০.৩০ মিনিট :

মোটামুটি ভোট চলছে, হঠাৎ একটি স্পটে উত্তেজনা। একজন ভোটার ভোট দিতে এসেছেন । ভোটার কার্ড অনুযায়ী বয়স ৭২। অথচ যিনি ভোট দিচ্ছেন তার বয়স কিছুতেই ৫২ বছরের বেশি নয়। বিরোধী এজেন্টের আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক ভোট দিলেন। আধঘণ্টা পর এই ভোটদাতার ছেলে এসে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আধঘণ্টা আগে এলে তার তিন বছর আগে মরে যাওয়া বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। প্রিসাইডিং অফিসার নিশ্চুপ। ক্ষমতাশীল দলের এজেন্ট মুচকি মুচকি হাসছেন।

দুপুর ১২.৪৫ মিনিট :

পাশের বুথে ব্যাপক হাঙ্গামা। এলাকার বহুপুরনো বাসিন্দা জনৈক ভদ্রমহিলার দাবি তিনি ভোটই দেননি। অথচ প্রিসাইডিং অফিসারের বক্তব্য তার ভোট পড়ে গেছে। চিৎকার চেঁচামেচির মাঝে প্রায় আধঘণ্টা ভোট বন্ধ থাকার পরে প্রিসাইডিং অফিসার টেন্ডার ভোট নেবেন বলে স্থির করলেন। সাধারণ মানুষের ভোটদানের অধিকারের সময় থেকে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেল। কেউ বুঝতেই পারলো না। শুধু ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক এজেন্টের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

দুপুর ২টো :

বুথের চারটি পার্টেই বেশকিছু বয়স্ক মানুষ ভোট দিতে এসেছেন। এদের সবাই নাকি কোনোভাবে বুঝতে পারছেন না যে, ভোটের মেশিনের কোন বোতামটি তাদের পছন্দের পার্থীর। তাই প্রত্যেকের ভোটদান পর্ব মাথাপিছু আট-নয় মিনিট সময় নিচ্ছে। স্লোপোল কেউ বলতে পারবেন না অথচ এই পর্বে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় প্রতিপার্টে পাঁচ থেকে ছয় জনের ভোট দিলেন।

দুপুর ৩.৩০ মিনিট :

প্রচণ্ড গরম। এপ্রিল-মে মাসের দাবদাহকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হতে যেসব ভোটাররা ভোট দিতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বাড়ি ফিরে গেছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ৩০ শতাংশ ভোটার। ভোট হচ্ছে মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ।

বিকেল ৪.৩০ মিনিট :

বুথের কোনো পার্টে বিরোধীদের এজেন্ট নেই। অসম্ভব দ্রুত ভোট হচ্ছে। ভোটকর্মীরা যেন কলের পুতুল। পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে যারা ভোট দিচ্ছে তাদের কারুর সঙ্গে ভোটার পরিচয় পত্রের কোনো মিল নেই। ১০-১২ জন মহিলা বোরখা পরে আছেন। বারবার আসছেন, বিভিন্ন মানুষের হয়ে ভোট দিচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন। একজন ভোটকর্মী ভোটার এপিকের সঙ্গে মুখ মেলাবেন বলাতে বোরখার আড়াল থেকে কঠিন চেতাবনি— 'পর্দানসীন লেডিজকা মু দেখনা চাতে হ্যাঁ? এ হামারি কোম কে খিলাপ হ্যায়।' ব্যাস— এভাবেই রুকসানার ভোট জাহানারা, আমিনা, ফাতেমা পেরিয়ে নুরজাহান অবধি চলবে। ভারতীয় রাজনীতির দুর্ভাগ্য যে ভোটদানকেন্দ্রে লুকাপের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কোনো আইন নেই। ভোটার পরিচয়পত্রের ছবি শুধু হিন্দুদের শনাক্তকরণের জন্য। ভারতের বসবাসকারী বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়।

বিকেল ৪টা :

ভোটপর্ব শেষ। প্রতিটি মেশিনকে নির্দিষ্ট ফর্মের সঙ্গে গালাদিয়ে সিল করা হয়েছে। একটু পরেই সেক্টর অফিস থেকে গাড়ি আসবে ভোটকর্মী এবং ভোটযন্ত্র স্ট্রংরুম অবধি পৌঁছে দেবে।

এই পুরো ঘটনা প্রতি ভোটে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অল্পবিস্তর ঘটে থাকে। নির্বাচন কমিশন কড়া না হলে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এ বিষয়ে সচেতন না হলে ভোটের নামে এই রিগিং ও প্রহসন চলতেই থাকবে।

প্রতি ছ'মাস অন্তর মৃত ভোটারদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে, নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সারা পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, নিজের আইডেন্টিটিকে লুকিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য পর্দানসীন আইন আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। ভোটার পরিচয় পত্রের সঙ্গে মুখ না মিললে কোনো ভোটারকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না। আগের রাতের তদারকি করার জন্য, ভোটকর্মীদের তোয়াজ করার জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। এছাড়া আইন অনুযায়ী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হবে।

দেশ পরিচালনায় নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সারাদেশে নির্বাচন চলছে। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুধু লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবে। বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেকথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। এখানে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তৃণমূল রাজ্যে শাসনক্ষমতা দখল করেছে। ওদিকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল দলের কোনও গুরুত্বই নেই। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার কারণে তৃণমূল বিভিন্ন ধরনের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ ও কারচুপিতে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে বা করবেই।

নির্বাচনী পূর্বাভাষ যা এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট-ই পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য দেশ শাসনের ভার পেতে চলেছে। অনেকেই মনে করছেন, ২০১৯-এর ভোটের মতোই এরাজ্যে বিজেপি ভালো ফল করতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী পূর্বাভাষ যেখানে বিজেপির পক্ষে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপি ছাড়া অন্য দলকে ভোট দিয়ে লাভ কী হবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলের যেখানে কোনো গুরুত্বই নেই সেখানে এরাজ্য থেকে তৃণমূল বা কংগ্রেস, সিপিএমকে ভোট দিয়ে লোকসভায় পাঠানোর কোনো মানেই হয় না। বিশেষ করে রাজ্যে যে দলের নেতা-মন্ত্রীদের গায়ে চোরের তকমা লেগে গেছে সেই দলের সাংসদ পদপ্রার্থীরা কতটুকু সৎ হবে তা গবেষণার বিষয়।

এদের একমাত্র কাজ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো ধরনের উন্নয়নমুখী কাজে বাধাদান করা। দেশ ও জাতির আর্থিক, সামাজিক এমনকী সুরক্ষা বিষয়ক কাজেও এরা কোনও সহযোগিতা তো করেই না, বরং পদে পদে বাধা দিয়ে দেশের ও দশের ক্ষতিসাধন করছে। দেশব্যাপী পেট্রোডলার ও পাকিস্তানি আইএসআই মদতপুষ্ট আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে কোনো আইনি ব্যবস্থা নিতে গেলেই ধর্মনিরপেক্ষী লেবেল সাঁটা সিপিএম, কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে একযোগে চিৎকার করছে তৃণমূল সাংসদরা।

স্বাধীনতার আগে রাজনীতি ছিল দেশসেবার নাম। দেশমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বাঙ্গালিদের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। স্বাধীনতার পরেও বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেনরা আদর্শবাদী রাজনীতি করতেন। দেশের উন্নয়ন ছিল তাঁদের কাছে মুখ্য। দেশসেবার আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আর এখন সারাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্রিমিনালদের স্বর্গরাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজশত্রুদের এমন নিরাপদ আশ্রয় ও সস্নেহ প্রশ্রয় কোনও রাজ্যসরকার দেয় না। এদের অপরাধ দমনে কেন্দ্র থেকে কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে গেলেই তৃণমূল দল ও তাদের সাংসদরা অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। কারণ এসব সমাজশত্রুরা 'দুধেল গাই' হিসেবে তৃণমূল দলের আশ্রিত এবং লালিত পালিত। তৃণমূল সাংসদরা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজশত্রুদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য মুখর তো হয় না বরং বাক্‌স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে সবসময় রাষ্ট্রদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারই ফলে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে বন্যার জলের মতো অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে জামাই আদরে থেকে দিন কাটাচ্ছে আর যত প্রকার অসামাজিক কাজে রাজ্যবাসীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। তার প্রমাণ তো কিছুদিন আগে তৃণমূলের নেত্রী রত্না বিশ্বাস বাংলাদেশিদের ভোটার লিস্টে নাম তোলার নির্দেশ দিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। যার জন্যে খুন, জখম, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ, জালিয়াতি, চোরাচালান, মাদকচালান প্রভৃতি

যতরকমের অপরাধ আছে তারই পীঠস্থান হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি। অতি সম্প্রতি তার প্রমাণ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারাদেশ এবং বিশ্ববাসী, সন্দেশখালির শেখ শাজাহান বাহিনী দ্বারা হিন্দু মা-বোনেদের ওপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। আর আশ্চর্যের বিষয়, সেই শাজাহানের মতো সন্ত্রাসীকে বাঁচাতে রাজ্য সরকার আমার-আপনার দেওয়া করের কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কাজেই তৃণমূল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ভোটার তার অন্তরের ক্ষোভ, হতাশা দূর করুন এবং নিজের সন্তান-সন্ততি সুস্থভাবে বাঁচার পথ সুগম করুন।

মানুষ একবার ঠকে, দুবার ঠকে; কিন্তু বারবার ঠকে না। দীর্ঘকালব্যাপী সিপিএম শাসনের কুপ্রভাবে বাঙ্গালির চিন্তাভাবনায় দৈন্যের ছাপ পড়েছিল। আর এখন ঠকবাজ, চোর, লুঠেরার দল তৃণমূলের পাল্লায় পড়ে বাঙ্গালি ৫০০-১০০০ টাকার ভিক্ষার লোভে নিজের ভালো-মন্দ বোঝার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। অনুপ্রবেশ সমস্যা বাঙ্গালিকে আজ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করার যে পথ করেছে, তাও এই তৃণমূল দলের অবদান। এই সমস্যার সঙ্গে আমার- আপনার পুত্র-পৌত্রাদির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও জড়িত।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে অলিখিতভাবে বাংলাদেশের সীমানা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৫-৩০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর তাদের অত্যাচারে সীমান্ত এলাকা থেকে হিন্দুরা সরে যাচ্ছে। আর সেসব এলাকায় বাংলাদেশি মুসলমানরা বিনা বাধায় বসতি গড়ে তুলছে। এখন তারাই পঞ্চায়েত, তারাই প্রধান, তারাই এমএলএ, এমনকী এমপি-ও। এইসব সম্ভব হচ্ছে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের প্রকাশ্য মদতে। এই প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে, তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে নিজহাতে নিজ সন্তানকে রাক্ষসের হাতে তুলে দেবার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

দেশবাসী দেখছে, যাঁর হাত ধরে দেশের শান্তি ও সুরক্ষায় একের পর এক সাফল্য এসেছে, আর্থিক পরিস্থিতি টালমাটাল অবস্থা কাটিয়ে উঠে এখন ঝড়ের গতিতে ঊর্ধ্বমুখে এগিয়ে চলেছে, তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। যার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন— আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশের স্বীকৃতি অর্জন করবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেজুড়বৃত্তি পরিত্যাগ করে দেশের স্বার্থের অনুকূল নীতি গৃহীত হয়েছে। তাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন— 'ভারত এখন আর কাউকে ভয় করে চলে না।' পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো চোর-ছ্যাঁচ্চোড়-গুন্ডা-বদমাস ও সন্ত্রাসী বলে ভারতবাসীর বদনাম নেই। শিল্প, বাণিজ্য, খেলাধুলা, সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐতিহ্য বিশ্বের জ্ঞানীগুণী মহলে প্রশংসা অর্জন করছে।

কিন্তু ওই যে কথায় বলে— 'সতীনের ছেলে রাজা হয়, এ দুঃখ কি গায়ে সয়?' বিজেপি পরিচালিত সরকারের আমলে ভারতের সার্বিক উন্নতি ও প্রগতিতে বিজেপি বিরোধীদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। দশ বছর ক্ষমতার মধুপানে বঞ্চিত কংগ্রেসিরা বোলতা-ভীমরুলের স্বভাব ধরেছে। কারণে অকারণে সরকারের গায়ে হুল ফোঁটাতে দ্বিধা করছে না। এরপর আরও পাঁচ বছর এই সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি হলে এসব বোলতা-ভীমরুলেরা আরও তেড়েফুড়ে উঠবে। তাই শেষ কামড় মারতে সঙ্গীসাথী বাছাবাছি নেই, জাত-বেজাত বাছবিচার নেই, আদর্শের বালাই নেই, চোর-ডাকাত-লুঠেরার, চোরাচালানকারী দেখাশোনা নেই; যারাই সরকারকে আঁচড়াতে কামড়াতে, খামচাতে, চিমটি কাটতে পারবে তারাই ওদের বন্ধু হবে। নখী, দন্তী, শৃঙ্গী সবাই তাদের জোটে স্বাগত। জোটের নেতারা সবাই নামে হিন্দু, কাজে হিন্দুর শত্রু। হিন্দু, হিন্দুত্ব, হিন্দুস্থানের ক্ষতিসাধনে ইসলামি ফাউন্ডেশন ও খ্রিস্টান সংস্থাগুলির টাকায় এরা লেজ নাড়ে। তার প্রমাণ দেশবাসী জেনেও গেছেন। জোটের এক দলের চোর তকমা পাওয়া এক সাংসদ নেত্রীকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে দেশের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য। উপরন্তু জোটের দুইদলের দুই রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রী চুরির দায়ে জেল হাজতে রয়েছেন।

এছাড়া, ইন্ডি জোটের ব্যর্থতাও প্রমাণিত। গত বছর পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট হয়েছে। তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়লাভ প্রমাণ করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, সিপিএম প্রভৃতি ২৬ দলের জোট ব্যর্থ। এদের মধ্যে কোনও সাধারণ কর্মসূচি নেই। কারণ কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের জন্য গঠিত জোট শরিকরা নিজ নিজ রাজ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার ও হিংসায় জড়িয়ে পড়েছে। তার জন্য জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা বলেছেন, বিজেপিকে অভিনন্দন জানানো উচিত। কারণ আমরা এই ফল আশা করিনি।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বঙ্গবাসী যদি একটা নড়বড়ে এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন দলকে ভোট দেয়, তাহলে তাঁদের প্রদত্ত ভোট যে জলে পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এবারে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগেই মনস্থির করতে হবে— হিন্দুদের একমাত্র রক্ষাকর্তা বিজেপির প্রতীক চিহ্ন পদ্মফুলে ভোট দিয়ে নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং রাজ্যকে রক্ষা করা। বঙ্গবাসীকে আরও ভাবতে হবে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বিশ্বজুড়ে ভারতের পরিচিতি, প্রতিপত্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং আর্থিক, সামরিক, কূটনৈতিক প্রতিটি স্তরেই বিশ্বের যে কোনো প্রভাবশালী দেশের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, দেশ মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশের বিকাশের এই ক্রমবর্ধমান গতি বজায় রাখতে হলে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই। □

হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব এই বাস্তবতাকে ধূলিসাৎ করবার চক্রান্ত চলছে

হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং এই বাস্তবতাকে ধূলিসাৎ করবার জন্য ইদ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের একটা অংশ যেভাবে বাইক নিয়ে তীব্র গতিতে রাস্তা জুড়ে আস্ফালন দেখালো আগামীদিনের জন্য হিন্দু ও হিন্দুত্বের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক অধ্যায়কে সুচিত করলো। ইদ উপলক্ষ্যে মুসলমান সমাজের এক অংশের তরুণরা কোথাও ১৫-২০ বা কোথাও ২৫-৩০ জনের এক-একটি দল করে সমগ্র রাস্তা জুড়ে হেলমেট না পড়ে আস্ফালন দেখালো। যা দেখে শান্তিকামী হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ ভীত ও সন্ত্রস্ত।

বারবার ভাবতে হচ্ছে আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা কি স্বাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা? নাকি বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি? এই প্রশ্নের উত্তর এখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুদের খোঁজা প্রয়োজন।

হিন্দু ও হিন্দুত্বের তীব্র বিরোধী বাম অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুরা তাদের সংস্কৃতিকে, তাদের ঐতিহ্যকে, তাদের পরম্পরাকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। বাম অপশাসনের মধ্যগগনে নাস্তিক হওয়াটা অথবা সেকুলার হওয়াটাই ছিল একটা অলিখিত প্রথা। বামপন্থী মানেই হিন্দুত্ব বিরোধী নাস্তিক, এটাই ছিল প্রচলিত প্রথা। হিন্দুত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে, পূজাপার্বণকে বর্জন করে হিন্দুদের ঘরে সিধ কাটতে বামপন্থীরা শুধু ওস্তাদই ছিল তাই নয়, রাজনৈতিকভাবে এই প্রচেষ্টাকে তারা প্রায় সফল করেই তুলেছিল। বাম জমানা ধ্বংস করে পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে তৃণমূলের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে হিন্দু ও হিন্দুত্ব বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ নগ্নরূপে এসে দাঁড়িয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস মানেই দেশবিরোধী, হিন্দুধর্ম বিরোধী একটি রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী অপশক্তি। তৃণমূল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দু ও হিন্দুত্বকে উৎখাত করে পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর ইসলামিক দেশে পরিণত করা। তাইতো বেশ কয়েক বছর আগে মালদার কালিয়াচকে থানা আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনো পর্যন্ত লকআপের মুখ দেখেনি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উগ্র ইসলামিক কার্যকলাপ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। খোদ কলকাতাতে বাইক চালানোর সময় হেলমেট না পরলে সাধারণ হিন্দুদের জরিমানার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ মুসলমানদের মাথাতে একটা ফেজ টুপি থাকলেই তাদের সবকিছুই ছাড়। এ কোন ধরনের আইন? তৃণমূলি শাসনের নাগপাশে পশ্চিমবঙ্গবাসী আটকা পড়ে আছে। এর থেকে মুক্তির উপায় পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্তিকা ক্রমশ ইসলামিক আগ্রাসনের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমান জনবসতি দিয়ে হিন্দু তীর্থস্থান ঘিরে ফেলো— এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করবার জন্য হিন্দু তীর্থস্থানের চারপাশ ক্রমশ মুসলমান বসতিতে পরিণত হচ্ছে। এই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাদ্রাসা তৈরি করে উগ্র ইসলামিক ভাষণে মানুষকে বিষিয়ে তুলবার চক্রান্ত প্রায় সফল। তাইতো সন্দেশখালিতে শেখ শাজাহান বাহিনী তর্জনির ইশারাতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটা বড়ো অংশ আজ অনুপ্রবেশকারী ইসলামিক অপশক্তি রোহিঙ্গাদের মুক্তাঞ্চল। এই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা অপশক্তি আগামীদিনে দেশ ও জাতির নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব এই শাশ্বত সত্যকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য রোহিঙ্গা অপশক্তিকে তৃণমূল জেহাদি ও রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। লোকসভা নির্বাচনে এই অস্ত্রের ব্যবহার আরও বেশি করে হবে।

২০২৪-এর সাধারণ লোকসভা নির্বাচন শুধুমাত্র কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনই নয়। এই নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হিন্দু ও হিন্দুত্বকে রক্ষা করতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদেই এ রাজ্য থেকে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল বিজেপিকে অনেক বেশি পদ্ম উপহার দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে একথা মনে রাখতে হবে, তাদের পূর্বপুরুষদের একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশে ভিটেমাটি, পুকুর, জমিজমা থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যাতে আগামীদিন আর একবার ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু না হয় তার জন্য এই লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করতে হবে শুধুমাত্র ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার অঙ্গীকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

মোটরবাইকে তীব্রগতির একদল উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান যুবক ইদের দিন পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে অঘোষিত জেহাদের ডাক দিল, সেই প্রশমনে এ রাজ্যে বসবাসকারী হিন্দুদেরকেই দিতে হবে। সনাতনী ঐতিহ্যকে সামনে রেখে শান্তি পূর্ণভাবে বৃহৎ হিন্দু ঐক্যই মুসলমানদের এই অঘোষিত জেহাদকে পরাস্ত করতে সফল হবে, এটাই বাস্তবতা। কারণ হিন্দুত্ব হলো একটি সদর্থক দর্শন। দর্শনকে বাদ দিয়ে পৃথিবী কোনোদিন এগিয়ে যায়নি। হিন্দুত্ব হলো ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব। হিন্দুত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমাজ। এই বাস্তবতাকে সমস্ত হিন্দুকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে হবে তবেই সফল হবে ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্বপ্ন।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজরোড, খয়রামারী, উ: ২৪ পরগনা।

তৃণমূলের শাসন : পশ্চিমবঙ্গের এক লজ্জাজনক অধ্যায়

প্রফুল্ল হাওলাদার

বাঙ্গালির লজ্জা, গোটা পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা, সারা দেশের কাছে লজ্জা, সমগ্র বিশ্বের কাছে লজ্জায় বাঙ্গালির মাথা নত হয়ে গেছে আজ। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা উন্নতমানের আদিম যুগ বললে কি ভুল হবে? যে বঙ্গের মনীষীরা সারা ভারতবর্ষ এমনকী গোটা বিশ্বকে মানবতার আলো দেখিয়েছিলেন, আজ সেই বঙ্গভূমি ভারতের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে এই বঙ্গভূমে উন্নতমানের সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানবতা বিকাশলাভ ঘটেছিল এবং এখানে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বঙ্গভূমি গৌর-নিতাই থেকে বামদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রামপ্রসাদ সেন, হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, স্বামী বিবেকানন্দের মতো অসংখ্য সাধকের জন্মভূমি। আজ সেই পশ্চিমবঙ্গ কোথায় অধঃপতিত হয়েছে?

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে এই বঙ্গ। অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশ, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যুবক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বাড়িঘর, আত্মীয় পরিজন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের জন্য হাসি মুখে আত্মবলি দিয়েছিলেন, আজ সেই বঙ্গ কোথায়?

দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট নামক জগদ্দল পাথর এই রাজ্য শাসন করেছে, যারা বিদেশি প্রেমিক, স্বদেশিদের তারা দেখতে পারত না। তাদের অন্যায় অত্যাচারে যেমন— মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু, সাঁইবাড়ি বিভিন্ন জায়গায় নারকীয় ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে তৃণমূল নামক রাজনৈতিক দলকে মানুষ বিপুল ভোটে জয়ী করে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় বসাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক আশা করেছিল এবার হয়তো একটু সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক উন্নতি হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি!

যাকে সততা ও গণতন্ত্রের প্রতীক ভেবে দেবীর আসনে বসিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, কয়েক বছর যেতে না যেতেই তিনি হয়ে উঠলেন নিষ্ঠুরতার প্রতীক। হিন্দুরা রাজতন্ত্রের যুগে রাজ্যের রানিকে রানিমা বলত, ছোটো বড়ো সবারই রানিমা হতেন। তিনিও প্রজাদের নিজ সন্তানের মতো দেখতেন। বর্তমানে এই গণতন্ত্রের যুগে মাত্র পাঁচ বছরের মেয়াদে রাজ্যের ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন, সাধারণ মানুষদের কোনো আমলই দিলেন না। তিনি একজন নারী হয়েও তাঁর মধ্যে কোনো মাতৃত্ববোধ নেই। আছে শুধু অহংকার আর দাম্ভিকতা। তাঁর কথাবার্তা ও ভাষণ সবই নিম্নরুচির।

এই বারো-তেরো বছরের শাসনকালে সারা পষিচমবঙ্গের আনাচে কানাচে যত নারীধর্ষণ এবং রাজনৈতিক খুন হয়েছে, সেগুলোতে তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। ধর্ষিতা কোনো নারী বা মেয়েকে চরিত্রহীন বা ধর্ষণের ঘটনাগুলিকে ছোটো ঘটনা বলেছেন। হাজার মায়ের চোখের জলে তাঁর কোনো অনুশোচনা হয়নি। কামদুনি, সন্দেশখালিতে যে বর্বরতার ঘটনা তাঁর হার্মাদ বাহিনী ঘটিয়েছে তা যেন বিশ্ব রেকর্ড করেছে! সন্দেশখালির মহিলাদের বহু বছর ধরে তাঁর স্নেহধন্য, মদতপুষ্ট শেখ শাজাহান, উত্তম, শিবু এবং তাদের বাহিনী রাত ১২টার পর তুলে নিয়ে যেত তাদের ডেরায়। সেখানে রাতের পর রাত ওই মহিলাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেখানে গ্রাম্য মহিলাদের ওপর হওয়া পাশবিক অত্যাচার— যাকে মুখ্যমন্ত্রী সাজানো ঘটনা বলে উল্লেখ করলেন। ওখানে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কোনো নিকট আত্মীয়া থাকতেন, তবে তাদের ওপর এই ধরনের অত্যাচার বলে মুখ্যমন্ত্রী সাজানো ঘটনা বলতে পারতেন? চুপ করে বসে থাকতেন? সন্দেশখালির মহিলারা বলেই দিয়েছেন যে ১০০০-১২০০ টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে তাদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। এখন সন্দেশখালিতে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের পাঠাচ্ছেন ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিতে, নামকীর্তন করতে।

সন্দেশখালিতে ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনী তল্লাশি করতে গেলে শেখ শাজাহানের লোকেরা ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর হামলা চালায়, তাদের মাথা ফাটায়। তবুও শাপে বর হয়েছে। ইডি সন্দেশখালিতে না গেলে সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে যে পৈশাচিক ঘটনা চলে আসছে তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে পারত না। এখন মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা ভারত এবং বিশ্বের লোক জানতে পারছে।

এই রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ইতিপূর্বে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রাস্তায় মিছিল করে শোক পালন করতে দেখা গেছে। কিন্তু সন্দেশখালিতে বছরের পর বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর দলের গুন্ডাবাহিনী মহিলাদের ওপর যে পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছে তা দেখে-শুনেও তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। প্রতিবাদ করার সৎসাহসটুকুও তাদের নেই।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নীতি হলো চোর চুরি করবে, কিন্তু তাকে চোর বলা যাবে না, তাকে ধরাও যাবে না। কিছু গরিব মানুষ আছে যারা কাজকর্ম না থাকায় পেটের দায়ে চুরি করে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক হয়ে তিনি বড়ো বড়ো চোর পুষে রেখেছেন। তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীরা গোরু চুরি, কয়লা চুরি, রেশনের মাল চুরি, শৌচাগার নির্মাণের টাকা চুরি, চাকরি চুরি করে বেড়ায়। সংক্ষেপে এই হলো তাঁর বারো-তেরো বছরের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যার এক কান কাটা সে রাস্তার পাশ দিয়ে যায়, যার দু'কান কাটা সে রাস্তার মাঝ দিয়ে যায়। এই জন্যই বলা হয় যে, চোরের মায়ের বড়ো গলা! মা-মাটি-মানুষ— এই শব্দ তিনটির চূড়ান্ত অপব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই শব্দবন্ধ তাঁর দল ও সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই অপশাসন থেকে রাজ্যের মানুষ মুক্তি চায়। লোকসভা ভোট রাজ্যের মানুষের সামনে একটা সুযোগ নিয়ে এসেছে। তার সদ্ব্যবহার এই রাজ্যের মানুষ না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর লজ্জা কোনোদিন ঘুচবে না। □

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিবাহপ্রথা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের বিচারে পঠনপাঠন, মনন, চিন্তনের ওপর ভিত্তি করে। আর আছে চতুরাশ্রম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আমাদের জীবন অতিবাহিত হয় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে কেন্দ্র করে। এগুলির গুরুত্ব আমাদের জীবনে অপরিসীম। এগুলি আমাদের মেনে চলতেই হবে, নতুবা সমাজব্যবস্থা হবে অস্থির, দেশ হয়ে উঠবে অশান্ত। সেজন্য বর্তমান যুবসমাজকে উপযুক্ত সময়ে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতেই হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের যুবসমাজের মধ্যে অনেকরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যেগুলির মধ্যে কিছু ইতিবাচক, আবার কিছু নেতিবাচক। বিবাহ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে যুবপ্রজন্ম সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছে অর্থাৎ তারা নিজেরা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম-মানসিকতার সঙ্গী পেলে তবেই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইছে। এজন্য তাদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে পরে আর বিয়ে করতেই চাইছে না। যুব প্রজন্মের এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। এই সমস্যাটি সমাজের একটি অন্যতম ব্যধিরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো— এই পরিস্থিতি কেন? দেখা গেছে সমাজে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, যা সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এরকম কেন হচ্ছে? এর প্রথম কারণ হলো যুবসমাজ প্রায় দু'দশক ধরে পাশ্চাত্যের দেশগুলির অনুকরণ করে চলেছে। আমেরিকার মতো দেশে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। তারা জীবনকে উপভোগ করার জন্য বিয়েকে আবশ্যক মানতে রাজি নয়। ভারতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এইসব দেখতে দেখতে তাদের মনের মধ্যেও ভয় ঢুকে গেছে। বিয়ের পরেও যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ বা আলাদা থাকতে হয়, তাহলে বিয়ে না করাই ভালো।

আবার এখনকার যুবসমাজ অতি আদরে-আহ্লাদে বড়ো হয়ে উঠেছে। সাধারণত ছোটো থেকেই অভিভাবকরা তাদের সব আবদার মেটাবার চেষ্টা করেছেন, ফলস্বরূপ 'না' শোনার অভ্যেস তৈরি হয়নি। সামঞ্জস্য, সমর্পণ ও ত্যাগ এদের মধ্যে কম আছে; অথচ একটি পরিবার দাঁড়িয়ে থাকে এগুলির ওপরে ভিত্তি করে। অপরদিকে শিক্ষাব্যবস্থায় চতুরাশ্রম সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা না থাকার কারণে, সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গী অতি ক্ষীণ।

আগে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে বিয়ে করতেই হতো, কিন্তু এখনকার মেয়েরা ছেলেদের মতোই লেখাপড়া শিখে উপার্জন করছে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার কারণে এরা জীবনে সবকিছু গুছিয়ে, তারপর বিয়ের কথা ভাবে। এভাবে থাকতে থাকতে একটা সময় পরে তাদের মধ্য থেকে বিয়ের ইচ্ছাটাই চলে যায়।

বিয়ের অন্যতম কারণ একজন সঙ্গী যার সঙ্গে ভালোভাবে সময় ব্যতীত করা যাবে, একাকীত্ব থাকবে না। এদিকে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ একা থাকলেও, একাকীত্ববোধ করে না। আর্থিক সুরক্ষার দৃষ্টিতে দেখলে, যুবসমাজ জানে যে বিবাহ একটি খুবই প্রয়োজনীয় প্রথা, কিন্তু তার থেকে আর্থিক সুরক্ষা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানিয়ে চলার অভ্যেস তৈরি না হওয়ার জন্য এরা কোনোরকম দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, ওদের ভাষায় এগুলো 'ঝামেলা'। এছাড়া পশ্চিমি দেশের 'লিভ-ইন' সম্পর্ক সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। যতদিন ভালো লাগে থাকব, না হলে সব ছেড়ে চলে যাব— অনেকটা এইরকম মানসিকতা।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি জীবন ভাবনাত্মকভাবে সহমত হয়, একাকিত্ব দূর হয়। এখন বুঝতে না পারলেও, যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়, তাহলে কয়েক দশক পরে এরা ভীষণ একা হয়ে যাবে। তখন একজন সঙ্গীর অভাব ভীষণভাবে অনুভব করবে। বয়স হলে শরীর, মন ভেঙে যাবে। কিছু মানুষ বিদেশের লিঙ্গ পরিবর্তন, সমকামিতার মতো ধ্বংসাত্মক রীতি আমাদের দেশে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হাজার হাজার বছর পুরানো আমাদের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনা— সেই সমাজচেতনা যে চতুরাশ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে, তার গুরুত্ব বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। পরিবারের মহিলারা নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টি আলোচনা করতে পারেন। বিবাহ প্রথা আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশকে ধরে রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ধারণা রাখলে, তারা অবশ্যই বুঝবে। তাদের সংসারী করার দায়িত্ব অনেকটাই বাড়ির মহিলাদের ওপর নির্ভর করে।

□

মিসক্যারেজ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

পাঁচটা সন্তান নষ্ট হয়েছে। প্রতিবারই হতাশা। কোনওটা পাঁচ মাসে, কোনওটা ৬ মাসে কোনওটা আবার ৭ মাসে নষ্ট হয়ে যায়। ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবনে ৫ বার এই একই ঘটনা, কুরে কুরে খেত মেয়েটাকে। মানসিকভাবেও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সংসারের শান্তিও তলানিতে ঠেকেছিল। নানা কথা, নানা গঞ্জনা। তারপর কয়েকমাস পরে 'মা' ডাক শুনতে পেল ৩৩ বছরের অনিমা। ষষ্ঠবারে সফল। তাও অনেক কসরত করে তবেই এই সফলতা।

পাঁচ বারের ব্যর্থতার পিছনে দায়ী সার্ভাইক্যাল ইনকম্পিটেন্স। অর্থাৎ সন্তানধারণে নয়, সন্তান গর্ভে আসার পর তাকে বয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতায় সে অত্যন্ত দুর্বল বা অসমর্থ। সেই কারণেই তার বার বার সন্তান নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এই সমস্যা কিন্তু অনেকেরই হয়। সমাধান অনেকেরই জানা নেই, অথবা সঠিক চিকিৎসার অভাবে হয়তো তাঁদের আর মা হওয়াই হয় না।

আগে জানুন কী এই সমস্যা?

সার্ভিক্স হলো জরায়ুমুখ। যা সরু নলের মতো হয়, যা ভ্যাজাইনা বা যোনির সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেকটা ফানেলের সরু পাইপের মতো। সন্তান প্রথম গর্ভে এলে সেক্ষেত্রে জরায়ুতে তা বাড়তে থাকে। প্রেগন্যান্সির প্রথম দিকে এই জরায়ুর মুখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলেও সার্ভিক্স বন্ধ অবস্থায় থাকে এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ নিরাপদ থাকে।

সাধারণত ভ্রূণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে সার্ভিক্সের মুখ বন্ধই থাকে। কিন্তু কখনও কখনও ইনকম্পিটেন্ট সার্ভিক্স বা সার্ভাইকাল ইনসাফিশিয়েন্সির জন্য (জন্মগত

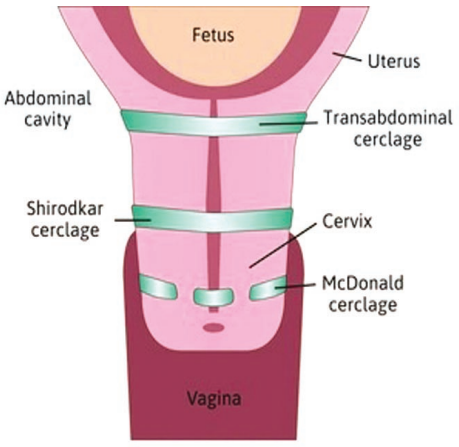

কারণ অথবা প্রথম সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণে) সময়ের আগে অপরিণত ভ্রূণ বেরিয়ে যায় (মিসক্যারেজ বা প্রিটার্ম বার্থ)। যেভাবে বারবার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অনিমার ৫টা সন্তান। ডাক্তারি পরিভাষায় এই সমস্যার নাম, সার্ভাইক্যাল ইনকম্পিটেন্স।

কী কী লক্ষণ থাকলে সাবধান হওয়া দরকার?

যাদের এক বা একাধিকবার অনিমার মতো আগে সন্তান নষ্ট হয়েছে তাদের ঘন ঘন আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হয় সার্ভিক্সের দৈর্ঘ্য (সার্ভাইক্যাল লেংথ অ্যান্ড ডায়ামিটার অব ইন্টারন্যাল ওএস) ঠিক আছে কিনা। এটা করতে হবে গর্ভে সন্তান আসার পর। এছাড়া গর্ভাবস্থায় হঠাৎ করেই অতিরিক্ত সাদাস্রাব নিঃসৃত হলে, কোমরে ব্যথা, যোনি ভেজা থাকা, নাভির নীচে ব্যথা বা ভারী হয়ে থাকা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ এর পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে সার্ভাইক্যাল ইনকম্পিটেন্স।

ইনকম্পিটেন্স থাকলে মা হতে গেলে কী করণীয়?

সাধারণত এই সমস্যা থাকলে সন্তানধারণের আগে কারও ক্ষেত্রে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রেগন্যান্সি এলে তারপর টের পাওয়া যায়। তাও লক্ষণ খুব কম। এটা বুঝতে টেস্ট রয়েছে। সেই টেস্ট করলে তারপর ধরা পড়ে। যদিও প্রেগন্যান্সির কম্পালসরি টেস্টের মধ্যে এটা পড়ে না। যাদের ক্ষেত্রে একাধিকবার সন্তান নষ্ট হয়েছে তাঁদের এই টেস্ট (সার্ভাইক্যাল লেংথ অ্যান্ড ইন্টারন্যাল অব ডায়ামিটার অব ইন্টারন্যাল ওএস) করতে বলা হয়।

রোগ ধরা পড়লে তখন প্রেগন্যান্সি আসার পরই জরায়ুর মুখ সেলাই করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির নাম সার্ভাইক্যাল সার্ক্লেজ বা ম্যাকডোনাল্ডস্ স্টিচ। এই সেলাই করে দিলে ভ্রূণ বৃদ্ধির সঙ্গে জরায়ুর মুখে চাপ পড়লেও তা খুলে যায় না। যাদের সার্ভিসের মুখ ২ বা ২.৫ সেন্টিমিটারের কম তাঁদের এই স্টিচ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই স্টিচ দিলে সন্তান সুস্থও থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে ডেলিভারিও সম্ভব। তবে অবশ্যই এটা করার আগে ভ্রূণের আইকিউ টেস্ট (আল্ট্রাসাউন্ড ও ডবল মার্কার ব্লাড টেস্ট) করে দেখা হয় ভ্রূণ পুরোপুরি সুস্থ কি না। ভ্রূণ পুরোপুরি সুস্থ থাকলে তখনই জরায়ুর মুখে এই সেলাই দেওয়া হয়। শুধু এই সমস্যা থাকলেই নয়, যাঁদের যমজ সন্তান হয় তাঁদের ক্ষেত্রেও সার্ভিক্সের মুখে চাপ পড়ে। তাঁদেরও এই স্টিচ দিয়ে মুখ বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ে।

আগে থেকে বুঝতে করণীয় কী?

সন্তান আসার আগে এইচএসজি টেস্ট করে দেখে নেওয়া সম্ভব সার্ভাইক্যাল ইনকম্পিটেন্স রয়েছে কি না। সেই মতো সন্তানধারণের সিদ্ধান্ত নিন। যাঁদের এই সমস্যা থাকবে তাঁদের ক্ষেত্রে জরায়ুর মুখে সেলাই দেওয়া ছাড়াও আরও কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। বিশেষ কিছু ওষুধও খেতে হয় এক্ষেত্রে। যেমন, আয়রন, ক্যালসিয়াম নেওয়ার পাশাপাশি প্রোজেস্টেরন হরমোনের সাপোর্ট নিতে হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ। □

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে হিংসা

কোনো নতুন শব্দ নয়

হীরক কর

১৯৮৪ সাল। পৌরসভা নির্বাচন। আমি ওই সময় পুরুলিয়া শহরে নির্মল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে থাকি। 'পুরুলিয়া গেজেট' কাগজে ছিলাম। সে বছরেই প্রথম এই সুবিশাল দেশের নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছি। আগের দিন রাতে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সুকুমার রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সুকুমারদা বললেন, হীরক চিন্তা নেই, সকাল সকাল তোমার বাড়িতে রিকশা পাঠিয়ে দেব। সাতসকালে ভোটটা দিয়ে দিও। যথারীতি ভোটের দিন সকালে রিকশা এসে গেল। রিকশায় ভোট দিতে চলেছি। সেন্ট্রাল ব্যাংকের মোড়ে ডাকসাইটে সিপিএম নেতা মণীন্দ্র গোপের সঙ্গে দেখা। একটা দুটো কথার পর মণীন্দ্রদা হাত তুলে বললেন, হীরক আমাদের মনে থাকে যেন। আমি হেসে চলে এলাম। একসময় ভোটার লাইনে আমার আঙুলে দাগ দেওয়ার পালা চলে এল। আমি ছাপটা আমাদের ওয়ার্ডের প্রার্থীকে মেরে দিলাম। অর্থাৎ কংগ্রেসের রিকশায় চড়ে অন্য দলকে ভোট। তখন অতটা বুঝিনি, অনেক পরে বুঝেছি, এই ভাবে শেষ মুহূর্তে ভোটারের মন বদলে যায়। কখনও কখনও ভালোবাসায়।

বিগত ৫০ বছর আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন সংস্কৃতি লক্ষ্য করি, তা বাম কিংবা তৃণমূল শাসনকাল যাই হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই অভিন্ন চরিত্রের প্রমাণ মেলে। আর ভোটারের মন বদলানোর জন্য ইভিএমের লাইনে নোংরা গালি দেওয়া থেকে শুরু করে পুরনো ধাঁচের মারধর, বোমাবাজি, আগের রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো ইত্যাদি নানা কৌশল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে জেতার জন্য অবলম্বন করে। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাকি ভারত কিছু শিখতে পারে তা হলো নির্বাচনে কারচুপির হরেক পদ্ধতি। বহুদিন আগে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন, 'বঙ্গ আজ যা ভাবে, ভারত আগামীকাল সে কথা ভাববে।' নবজাগরণের দিনে পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও দেশপ্রেমের পথ দেখিয়েছিল। আফশোসের কিছু নেই, সেই দিনগুলো বহু বছর আগে চলে গেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোট হচ্ছে সাত দফায়। সারা ভারতের তালিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে ভোট হয়েছে একদফায়। অথচ সাত দফায় ভোট হচ্ছে বিহার-উত্তরপ্রদেশে। যেখানে নাকি গ্যাংওয়ার সর্বজনবিদিত। আর বিহার-উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে একই দফায় স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সাধারণ বাঙ্গালি এই তালিকা দেখে আদৌ কি লজ্জা পায়?

বছর ১৫ আগের হাওড়া কর্পোরেশনের নির্বাচন। আমি তখন ই-টিভির সাংবাদিক। সঙ্গী ক্যামেরাম্যান সোমেন দাস। উত্তর হাওড়ায় আমাদের ভোটের ডিউটি। সালকিয়ার কাছে একটা জায়গায় হঠাৎই গিপ-গাপ

বোমা পড়তে শুরু করল। যারা বোমা মারল, তারা আমাদের পিছন থেকে এসে ডিসকাসের থ্রো-তে বোমা ছুঁড়তে থাকল। টেলিভিশনের ক্যামেরাকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এবার তাদের প্রতিপক্ষ উলটো দিক থেকে বোমা ছুঁড়তে লাগলো। দু-একটা পড়ল আমাদের আশেপাশে। প্রাণ বাঁচাতে ছুটলাম রুদ্ধশ্বাসে। উঠে পড়লাম পাশেই একটা বহুতলের ছাদে। দুই পক্ষের বোমের শব্দ চলছে। কিন্তু ছাদের দরজায় তালা। নীচের তলায় নেমে রাস্তামুখী একটা ফ্ল্যাটের দরজায় দুমদাম ধাক্কা দিতে লাগলাম। আতঙ্কিত গৃহকর্তা দরজা খুলতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুড়মুড়িয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে সোজা রাস্তার ধারে ব্যালকনিতে। বোমাবাজির ছবি উঠল আজকের ড্রোন ক্যামেরার মতো। কিন্তু ততক্ষণে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে পায়ে ধরছেন ওই অবাঙ্গালি দম্পতি। হাত জোড় করে তাঁদের আবেদন, আপনারা ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান, ওঁরা জানতে পারলে এ পাড়ায় আমাদের বাঁচতে দেবে না। অগত্যা নীচে নামলাম। পরিস্থিতি শান্ত হলে স্থানীয় স্কুলের পোলিং বুথে এসে দেখি প্রিসাইডিং অফিসার মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। কারা যেন ওই বোমাবাজির মধ্যেই রিভলবার উঁচিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে চলে গেছে। বাঙ্গালি ভোটারের শেষমুহূর্তে মন বদলে যায় তবে!

১৯৯২ সালের ৮ জুন। বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছিল। তবে খেলাটা হয়েছিল ১২ জুন ভোট গণনার দিন। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে প্রথমদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থী রবীন দেব হারছিলেন। শেষের দিকে ব্যালট পেপার ঘুরিয়ে কারচুপি করে রবীনবাবুকে জিতিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ফলে সেই সময় তিনি বিধানসভার অন্দরে ঢুকলে 'রিগিং দেব' বলে শোরগোল তুলতেন বিরোধীরা।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে 'হিংসা' কোনো নতুন শব্দ নয়। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ইতিহাস বলে, এখানে এমন কোনও ভোট হয়নি, যেখানে হিংসা হয়নি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমল থেকে জ্যোতিবাবুর সময় পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনে নির্বাচনে হিংসা সব সময় দেখা গেছে। সিপিএম যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করতেন যে, পুলিশ ও সিপিএমের দলীয় কর্মীরা তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, যৌথভাবে জেলায় জেলায় হিংসা চালায়, সন্ত্রাস চালায়। তখন এবং এখনোও একটা গ্রামে পঞ্চায়েতের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্যও কিন্তু হিংসার সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থাৎ এ রাজ্যে বাহুবলীরা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে রেখেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে এই হিংস্রতা আরও প্রকট ও প্রবল আকার ধারণ করেছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, গত কয়েক বছরে হিংসার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। ভারতীয় জনতা পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম দলগুলো একে অপরকে তাদের কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলা ও হত্যার অভিযোগ করে আসছে। অভিযোগ-পালটা অভিযোগের এই চক্র হঠাৎ করে আসেনি। তৃণমূল জমানায় ২০১৩ ও ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন কার্যত পরিণত হয় প্রহসনে। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০০-রও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। তবে তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে, এটি গত বছর পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুরু হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম জানায়, ওই নির্বাচনের সময় প্রায় ৫০ জন মারা গেছে। 'হিংসা-মৃত্যু' নিয়েও এই রাজ্যের একটা ইতিহাস আছে। ১৯৯০-এর সিপিএমের শাসনকালে ভোটের হিংসায় ৪০০ জন নিহত হয়েছিল। ২০০৩-এ মারা যায় ৪০ জন। প্রতিটি মৃত্যুই একটি ট্র্যাজেডি। শাসকরা বলেন, আগের সময়ের তুলনায় এখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি। হ্যাঁ, কয়েক ডজন ঘটনা। ৫৬ হাজার বুথের মধ্যে ৪০টি। একেও কি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলা চলে?

ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রতিবেদন এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো দেখলে বোঝা যায়, যে পশ্চিমবঙ্গ এবং নির্বাচন সংক্রান্ত হিংসা একসঙ্গে চলে। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোট সংক্রান্ত হিংসায় ভারত জুড়ে মোট ১৬ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই মৃত্যুর

শতাংশ সবচেয়ে বেশি ছিল। ৪৪ শতাংশ। অর্থাৎ সাতটি মৃত্যু, বলে এই রাজ্যের রিপোর্টে বলা হয়েছিল। যখন আহতের কথা আসে, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট তুলে ধরে যে ২ হাজার ৮ জন রাজনৈতিক কর্মী এবং ১ হাজার ৩৫৪ জন সাধারণ মানুষ ওই লোকসভা নির্বাচনের সময় হিংসায় আহত হয়েছিলেন। ২ হাজার ৮ জন রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে ১২৯৮ জন পশ্চিমবঙ্গের। অর্থাৎ ৬৪ শতাংশ। এছাড়াও, ভোট সংক্রান্ত হিংসায় আহত ১ হাজার ৩৫৪ জন সাধারণ মানুষ, সবাই পশ্চিমবঙ্গের।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৯৯ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৮ বছরে, গড়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর ২০টি রাজনৈতিক হত্যার সাক্ষী থেকেছে। সবচেয়ে বেশি ছিল ২০০৯ সালে যখন রাজনৈতিক কারণে ৫০টি খুন হয়েছিল। ২০০০, ২০১০ এবং ২০১১ সালের প্রতিটিতে ৩৮টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

২০০৯-এর আগস্ট মাসে সিপিএম একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে। যাতে তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সেই বছরের ২ মার্চ থেকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের ৬২ জন সমর্থককে খুন করার জন্য অভিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গের সবকটি রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে এই ধরনের অভিযোগ তুলে চলেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস গত এক দশকেরও বেশি সময় পর্যন্ত প্রসারিত। সম্প্রতি বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শাসক দলের হিংসার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে, যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বর্ণালিতে তৃণমূল বা বিজেপি কোথাও ছিল না, তখন বাম ও কংগ্রেস

প্রায়শই সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। ১৯৮৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্য বিধানসভায় কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছিলেন। সেই পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল যে ১৯৮৮-৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৮৬ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছিলেন। জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, তাদের মধ্যে ৩৪ জন সিপিএম, ১৯ জন কংগ্রেস, দুজন ফরোয়ার্ড ব্লকের, সাতজন আরএসপি এবং বাকিরা অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের।

সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা সিপিএমের নির্দেশে তাদের কর্মীদের ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কারণে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছিল যে ১৯৮৯ সালের প্রথম ৫০ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৬টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে 'পশ্চিমবঙ্গের জীবন অনিরাপদ হয়ে উঠেছে'। পরিসংখ্যান আরও দেখায় যে পশ্চিমবঙ্গে ভোট-সম্পর্কিত হিংসা একচেটিয়াভাবে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের বারো বছরের শাসনের ফসল নয়। অতীতেও একই ধরনের

বহু হিংসার মুখোমুখি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন পশ্চিমবঙ্গ একটি কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। সেবারের নির্বাচনে সারাদেশে মোট ৫ হাজার ৩১৫টি নির্বাচনকালীন অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ অর্থাৎ ৯৬৩টি অপরাধের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০১৪ সালে, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যে ৯৩১টি নির্বাচনকালীন অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছিল। দেশে এ ধরনের অপরাধের মোট সংখ্যা ছিল ৭,৭৮৭টি। এইভাবে, দুই শাসনকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত অপরাধের সংখ্যায় বড়ো কোনো পরিবর্তন না হলেও, জাতীয় চিত্রে রাজ্যের অংশ সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদনে হিংসাত্মক ও অহিংস অপরাধকে আলাদাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি।। বিগত দুটি লোকসভা নির্বাচনে ২০১৪ ও ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে পোল-টাইম অপরাধের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো যে বেশিরভাগ রাজ্য প্রাথমিকভাবে ভোটের দিন এই অপরাধগুলো প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভোট-পরবর্তী সময়ে অপরাধ বেড়েছে। ২০০৯ ও ২০১৪ সালে নির্বাচনের সময় রেকর্ড করা অপরাধের সর্বভারতীয় তথ্য দেখায় যে বেশিরভাগ অপরাধ প্রাক-ভোট সময়কালে রিপোর্ট করা হয়েছিল। ২০০৯ সালে ৬৫ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৭৪ শতাংশ। ভোট-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে কম সংখ্যক অপরাধ রিপোর্ট করা হয়।

'ভয়' পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের বড়ো দুর্বলতা। এই সত্য থেকে বোঝা যায় যে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতের মধ্যে এই রাজ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রাম ছিল যেগুলো নির্বাচনের সময় ভয় দেখিয়ে এবং পেশী শক্তির ব্যবহার করে ভোটারদের ভোটদান থেকে বিরত করা হয়েছিল। বিহার ছিল এই তালিকার শীর্ষে। সেখানে ২০ হাজার ১৭৯টি অরক্ষিত গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে সংখ্যাটি ছিল ১৮ হাজার ৮১০টি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য দেখায় যে পশ্চিমবঙ্গে, প্রতি চারজন দুর্বল ভোটারের মধ্যে, একজন ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। ভয় দেখানোর জন্য দুর্বল ভোটারদের এই অনুপাত বড়ো রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ ভোটারের মন বদলে যায় আচমকা সন্ত্রাসে।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটকেন্দ্র ছিল যেগুলোকে নির্বাচন কমিশন স্পর্শকাতর হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে। রাজ্যে ৭৭,২৫৩টি ভোটকেন্দ্র ছিল এবং তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ৩৭,৫৫৩ টিকে গুরুতর বলে অভিহিত করা হয়।

একটি ভোটকেন্দ্রকে অনেক কারণে স্পর্শকাতর হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন— একজন প্রার্থীর পক্ষে ৭৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। এটি বিগত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিপুল সংখ্যক অনুপস্থিত ভোটার রয়েছেন ভয়ভীতি প্রবণতার ফলে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গও ছিল সেই রাজ্য যেখানে ২০১৪ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ২০১৪ সালে সমস্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের ৪৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের উর্বর এবং অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিতে সংঘটিত হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য গোটাদেশে ৩৭,৪২৩টি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে, যাতে পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশের পরেই দ্বিতীয় ছিল, ৪,২৩৭টি।

হিংসা, হানাহানি, বোমাবাজি! পশ্চিমবঙ্গে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছে এই শব্দগুলো। চিত্রটা বদলায়নি, ২০২১-এর ২ মে-র ভয়াবহ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের পর ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও মৃত্যু হলো একাধিক মানুষের। '২০১৮-এর পুনরাবৃত্তি যেন ২৩-এ না হয়'। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার আগে থেকে এবং ঘোষণার পরে শাসক, বিরোধী সবার মুখে একত্রে শোনা গিয়েছিল এই কথা। যদিও যুযুধান এই বিরোধীপক্ষগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। বাস্তবে ভোটগ্রহণের দিনে দেখা গেল ১৮-র ছবি তেইশে ফেরেনি ঠিকই, বরং সন্ত্রাস মিটারে ভয়াবহতা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে নয়া বেঞ্চমার্ক সেট করল ২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন। বোমা, ছাপ্পা, গোলা, গুলিতে রক্তে ভিজল পশ্চিমবঙ্গের মাটি। ১০ ঘণ্টায় গণতন্ত্রের রক্তপূজায় বলি ১২টি তরতাজা প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গের বুকে নামল 'রেড স্যাটার্ডে'।

৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েও ভোটের সকাল পর্যন্তও মেলেনি পর্যাপ্ত বাহিনী। প্রত্যেক বুথে ভোটের শেষ লগ্ন অবধিও মেলেনি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সূত্রে খবর, ৬০ হাজার বুথের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সম্ভব হয়েছিল। বুথে বুথে সন্ত্রাস, ছাপ্পা, বোমাবাজি, মৃত্যু এই নিয়েই শেষ হয় গ্রামীণ প্রশাসনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া।

রাজভবন, কমিশন, সামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশের নজরদারি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের 'উৎসব' পরিণত হলো— শবোৎসবে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগেও জেলায় জেলায় বুথে বুথে ব্লকে ব্লকে শুরু হয় নগ্ন ব্যালট

কারচুপি। বুথে বুথে ছাপ্পাভোটে তৃণমূলই নয়, অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধেও। ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ সামাল দিতে পালটা ব্যালট বাক্সে জমা পড়া জনতার জনমত কোথাও ভাসল জলে, কোথাও আবার বাক্স সমেত ব্যালটের ঠাঁই হলো নর্দমায়। এছাড়া ব্যালট পেপারে ছাপ্পা আটকে বাক্সের মধ্যে কোথাও ঢেলে দেওয়া হলো ফ্যান, তো কোথাও জল। তা সত্ত্বেও বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৬৬.৫৮ শতাংশ।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের এলাকা থেকে অভিযোগ উঠেছিল, কোথাও যত জন ভোট দিয়েছেন, গণনার সময় ব্যালট বাক্সে ততগুলো ব্যালট পেপারই মেলেনি। আবার কোথাও যত ভোট পড়েছে, সেই বুথে প্রার্থীদের মোট প্রাপ্ত ভোট তার চেয়ে বেশি। বিরোধীদের নালিশ, পঞ্চায়েত ভোটে বুথে বুথে যে 'ভূতে' ভোট দিয়েছে, গণনাতেও নজিরবিহীন কারচুপি হয়েছে, এসব তারই প্রমাণ। বিরোধীদের দাবি, নানা সূত্রে পাওয়া পঞ্চায়েত ভোটের গণনার খুঁটিনাটি তথ্য কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু বুথে নয়, 'ভূতে'র তাণ্ডব হয়েছে গণনাকেন্দ্রেও। যেমন, গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি আসনে ২১ ভোটে জিতেছে তৃণমূল। তারা পেয়েছে ২৩০টি ভোট, কংগ্রেস ২০৯টি ভোট। ওই বুথে ভোটার ছিলেন ১,০১৭ জন। ভোট দেন ৮০৭

জন। গণনার সময়ে বাতিল হয় ৩৪২টি ভোট। অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৪২ শতাংশ বাতিল হয়েছে। দুই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট এবং বাতিল ভোট মিলিয়ে হচ্ছে ৭৮১। বাকি ২৬টি ব্যালটের হদিশই মেলেনি। আর একটি বুথে আবার গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল পেয়েছে ৬৪৪টি ভোট। প্রতিপক্ষ নির্দল পেয়েছেন ৩৩০টি ভোট। এখানে বাতিল হয়েছে ৬৭টি ভোট। ভোট দিয়েছিলেন ১,০৬৪ জন। এখানেও ২৬টি ব্যালট পাওয়া যায়নি।

সূত্রের দাবি, অন্য একটি বুথে আবার প্রদত্ত ভোটের থেকে গোনা ভোটের সংখ্যা বেশি। এখানে তৃণমূল পেয়েছে ৯৬৩টি ভোট। সিপিএম ১০৪টি। বাতিল হয়েছে ৩৩টি ভোট। এখানে ভোট দিয়েছিলেন ১,০৯৭ জন। অথচ বাতিল হওয়া আর দুই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট মিলিয়ে সংখ্যাটা ১,১০০। অর্থাৎ তিনটি ভোট বেশি। আর একটি বুথেও ভোট দিয়েছিলেন ১,০৩৪ জন। বাতিল হয় ৪৪টি ভোট। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পেয়েছে ৬০০টি। দুই নির্দলের একজন পেয়েছে ২১টি, আর একজন ৩৭০টি। বাতিল ভোট আর প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট মেলালে হচ্ছে ১,০৩৫। অর্থাৎ একটি ভোট বেশি।

কেশপুরের এক প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর মতে, এমনটা হতেই পারে, কেউ ব্যালট পেপার নিয়ে, ছাপ মেরে আর ব্যালট বাক্সে ঢোকাননি। জামা বা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। আবার এমনটাও হতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যালট পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা পরিষদ আসনের জন্য নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

গরমিলের ছবি কাঁথিতেও। কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের আউরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৫ নম্বর বুথে কলাগাছিয়ায় ৪০৭ জন এবং ১৫৬ নম্বর বুথে উমাপতিবাড় শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ৭১৮ জন ভোটার রয়েছেন। সব মিলিয়ে ভোটার ১১২২ জন। তবে, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য তুলে জানানো হয়েছে, ওই দুই বুথে তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ১,৫০২টি ভোট। আর বিজেপি পেয়েছে ১৭৪টি ভোট। অর্থাৎ ভোট পড়েছে ১,৬৭৬টি, যা মোট ভোটারের তুলনায় ৫৫৪টি বেশি। মামলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও প্রশাসনের দাবি, কিছু ভুল হয়েছিল। পরে ওয়েবসাইটে সেটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানো হলেও তাঁদের কাজে লাগানো হয়নি বলে অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ সর্বত্র অশান্তির চিত্র উঠে আসে। বোমাবাজি হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকায়। রিগিং, বুথ দখল, মনোনয়ন নিয়ে অশান্তির ছবি একাধিকবার দেখেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তবে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নজির হয়ে থাকবে ব্যালট ভক্ষণ। গণনা চলাকালীন উত্তর ২৪ পরগনায় হাবড়ার একটি গণনা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটির বিরুদ্ধে ব্যালট পেপার গিলে খেয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সিপিএম প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ মজুমদার অভিযোগ তোলেন, এই ঘটনা ভোটের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

(ফাইল চিত্র)

ভোট গণনায় কারচুপি ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন কি সত্যিই আন্তরিক?

সাধন কুমার পাল

ব্যালট পেপারে যখন ভোট হতো সে সময় ভোট গ্রহণ থেকে শুরু করে গণনা পর্যন্ত হওয়া কারচুপির জেরে জেরবার হয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, অবাধ ও দ্রুত করার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) আবির্ভাব হলো। কিন্তু ইভিএম ব্যবস্থাও গণতন্ত্রকে ভোট লুটেরাদের হাত থেকে যে বাঁচাতে পারেনি। বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট আগে যেমন হতো এখনো হচ্ছে। আগের মতোই ভোট লুটেরাদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না গণনা প্রক্রিয়াও।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগের সঙ্গে পুনর্গণনার দাবিতে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। কারণ মানিকতলা কেন্দ্রের গণনায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। ২ মে ভোট গণনার পরে পরেই নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন মানিকতলার পরাজিত বিজেপি প্রার্থী। ওই চিঠিতে তিনি মানিকতলার ভোটের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছিলেন। পাণ্ডবেশ্বরের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং মহিষাদলের পরাজিত প্রার্থী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী সৌজিত সিংহও পুনর্গণনার দাবিতে মামলা করেছিলেন। বিজেপির তরফে একাধিক আসনে পুনর্গণনার দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটাতে মামলা করার ধরন দেখে এটা স্পষ্ট যে গণনার সময় কারচুপি করা হলেও সবগুলোতে মামলা করা হয়নি। বিজেপির করা পুনর্গণনা মামলা ইস্যুগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য নন্দীগ্রাম আসনের নির্বাচনী ফল নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর বনগাঁ দক্ষিণ, বলরামপুর, ময়না, গোঘাট— এই চারটি আসনে পুনর্গণনার আবেদন জানিয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে মামলা করা হয়েছিল।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল যে গণনা কেন্দ্রেই নাকি মানুষের রায় পালটে দেওয়া হয়েছিল। ফেক আইএএস দেবাঞ্জন দেব গ্রেপ্তারের পর থেকেই একের পর এক ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রতারণার ঘটনা রাজ্যজুড়ে প্রকাশ্যে এসেছে। ভুয়ো সিবিআই অফিসার, ভুয়ো আইনজীবী, ভুয়ো মানবাধিকার কর্মী, এমনকী ভুয়ো সাংবাদিকও ধরা পড়ছে। শহর জুড়ে নীলবাতি গাড়ির অপব্যবহারের ছবিও ধরা পড়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে এমন বহু গাড়ি। ফলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আশঙ্কা আরও তীব্রতর হয়েছিল যে আইপ্যাকের সহায়তায় গণনা কেন্দ্রে এরকম ফেক সরকারি অফিসার ঢুকিয়ে দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল পালটে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া সরকারি কর্মচারীদের মাথার উপরেও ঝুলছিল মমতা অভিষেকের সেই হুমকি, কথা না শুনলে নির্বাচনের পরে দেখে নেওয়া হবে।

বিরোধী দলের এজেন্টদের মোটা অর্থের বিনিময়ে কিনে নেওয়া, যেখানে এই কেনাবেচা সম্ভব হয়নি সেখানে হুমকি দিয়ে গণনা কেন্দ্রের বাইরে বের করে দেওয়ার প্রচুর ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ঘটেছে। তৃণমূলের সন্ত্রাসের জন্য বিরোধী দলের এজেন্টরা গণনা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেনি এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। গণনা কেন্দ্রের ভিতরেও চলেছে নিরন্তর হুমকি। এই হুমকির জেরে অনেক জায়গায় বিরোধী দলের এজেন্টরা প্রাণ হাতে নিয়ে গণনা কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন।

লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনের সময় খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রত্যেক কেন্দ্রেই বেশ কিছু নির্দল এবং রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক কিছু দলের প্রার্থী থাকে। আমি নিজস্ব প্রচেষ্টায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি এদেরকে ভোটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। এদেরকে অর্থ দেওয়া হয়, নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের এজেন্টরা বুথে এবং গণনা কেন্দ্রে যে সমস্ত এজেন্ট পাঠায় তারা আসলে ক্ষমতাসীন দলের হয়ে কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরা টোপে থাকা গণনা কেন্দ্রের মধ্যেও ক্ষমতাসীন দল থাকে 'দলে ভারী'। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলের একজন এজেন্টের পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের হয়ে কাজ করা 'এজেন্ট জোট'-কে মোকাবিলা করা এত সহজ নয়। কোনো অভিযোগ এলে বিরোধী দলের একমাত্র এজেন্টের অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না, যখন কিনা আইনগতভাবে বিভিন্ন দলের এজেন্টরা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে একসাথে কথা বলে।

আইপ্যাকের লোকেরা বিজেপির গণনা এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়েছে এমন অভিযোগও উঠেছিল ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে। বিরোধী শূন্য গণনা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসারের টেবিলে গিয়ে ফলাফল উলটে গিয়েছে এমন অভিযোগও উঠেছিল। ২০২১ সালে ভোট গণনার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িতরা এই সমস্ত অভিযোগ বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এজন্য মানুষের মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে ভোট গণনায় অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে প্রয়োজনে ভিন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের গণনার কাজে লাগানো যেতে পারে। যারা কিনা তৃণমূল সরকারের হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে না। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যার মাধ্যমে অন্তত দশ শতাংশ ক্ষেত্রে গণনা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ইভিএমের প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করতে পারে। যারা গণনা কেন্দ্রে দলের এজেন্ট হয়ে কাজ করবেন, গণনা কেন্দ্রে ঢোকার আগে পর্যন্ত তাদের পরিচয় গোপন রাখা প্রয়োজন, যাতে অন্য কোনো দল টাকাপয়সা দিয়ে তাদেরকে গণনা শুরুর আগেই কিনে নেওয়ার সুযোগ না পায়। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে এই হুমকি মোকাবিলায় আরও বেশি পর্যবেক্ষক রাখা প্রয়োজন। গণনা কারচুপি ঠেকানোর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

কেশব ভবনে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মিলন উৎসব

গত ২৪ এপ্রিল বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে কলকাতা মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনের সভাগৃহে এক মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। অমিত দে-র উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমিতির সেবাকাজে যুক্ত নবীন ও প্রবীণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে চিত্তকর্ষক। দেশভক্তি, রাষ্ট্রভক্তি এবং সেই সঙ্গে সুসংগঠিত সমাজ নির্মাণই আমাদের কাজের চালিকাশক্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুনীলপদ গোস্বামী, অজয় নন্দী, বিশ্বনাথ নন্দী, সমিতির সম্পাদক অরিন্দম সিংহরায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন চিত্রা দাস, স্রোতস্বিনী কাহার এবং কৃষ্ণনগর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনজন ছাত্র সমিতির সেবাকাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বলে জানান।

১৯৫১ সালে সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষদের গৃহসংস্কার, ছাত্রাবাস নির্মাণে সহায়তা প্রদান, অসুস্থ মানুষদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির ইত্যাদি নানাবিধ সেবাকাজ সমিতি করে চলেছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সমিতির অন্যতম কার্যকর্তা রঞ্জন সেন।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে রামনবমী স্মারক অনুষ্ঠান

ঝাড়গ্রাম হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৯ এপ্রিল ঝাড়গ্রামের বলাকা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় রামনবমী স্মারক সম্মান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রামের ৪৫টি রামনবমী উদ্‌যাপন সমিতিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে ঝাড়গ্রাম জেলা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ স্বদেশ ফৌজদার, সহবিভাগ কার্যবাহ সমীরণ গোস্বামী, বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ উত্তম বেজ, সহকার ভারতীর ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক মহান্তি ও ভূপেন্দ্র সিংহ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা, লেখিকা, আকাশবাণী কলকাতার সঞ্চালিকা, লোকশিল্পী, ড্রামা আর্টিস্ট, ঝুমুর গানে সংগীত নাটক আকাদেমি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এবং মরমিয়া ট্রাস্টের ডিরেক্টর মধুশ্রী হাতিয়াল।

সভানেত্রী তাঁর ভাষণ ওঁ উচ্চরণের মধ্য দিয়ে শুরু করেন। সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি রামনবমী উদ্‌যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপরে স্বদেশ ফৌজদার বক্তব্য রাখেন। নৃত্য ও গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে বহরমপুরে জনজাগরণ

ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও) মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১ মে বহরমপুর শহরের হোটেল লেক ভিউ অডিটরিয়ামে এক জনজাগরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, উকিল, চিকিৎসক-সহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ হরিনারায়ণ ফতেপুরিয়া এবং বহরমপুর লোকসভার প্রার্থী তথা জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা সমাজ জাগরণে চিকিৎসকদের ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন এনএমও-র প্রান্ত সচিব ডাঃ মৃন্ময় অধিকারী। বন্দেমাতরম সংগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

‘বঙ্গে রাজা রামচন্দ্রের পুজো ও রামায়ণ চর্চা’ বিষয়ক আলোচনা চক্র

অখণ্ড ভারতীয় সনাতনী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৮ মে কলকাতার ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত হলো ‘বঙ্গে রাজা রামচন্দ্রের পুজো ও রামায়ণ চর্চা’ বিষয়ক আলোচনা চক্র। উপস্থিত ছিলেন শ্রী সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রী জগদার্তিহা দাস, রিষড়া প্রেম মন্দিরের শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক রবিকিংকর ঘোষ, আইনজীবী মিতা ব্যানার্জি ও আইনজীবী নবীন কুমার জিন্দাল। পরিপূর্ণ সভাগৃহে গুরুগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। উপস্থিত সকলকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে রামায়ণ গ্রন্থ প্রদান করা হয়।

শ্যামপুকুরে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে , বাস্তুহার সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় এবং বৈভবী শাম্ভবী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গত ২৮ এপ্রিল উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরের সামন্ত বাড়িতে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২০ জন রক্তদান করেন। তাদের মধ্যে ১জন মহিলা। শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, উত্তর কলকাতা বিভাগ কার্যবাহ শুভঙ্কর কুণ্ডু।

বহরমপুরে গোরাবাজার সরস্বতী শিশুমন্দিরে প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলন

গত ২৮ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের গোরাবাজার সরস্বতী শিশুমন্দিরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (এবিআরএসএম) উদ্যোগে এক প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবিআরএসএম- এর রাজ্য সম্পাদক বাপি প্রামাণিক।

তথাগত বুদ্ধ
বিবেক ও রবীন্দ্র মানসে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্ব জনমানসের মধ্যে আড়াই হাজার বছর ধরে বিশ্বাস যে, শাক্যসিংহ মৈত্রেয় জাতক তথাগত বুদ্ধ ছিলেন মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর,

শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরপুরুষ। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষ রাঘব শ্রীরামচন্দ্র। বংশতালিকা থেকে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বহু বিদগ্ধজন। শ্রীরাম-তনয় কুশের বংশে সিদ্ধার্থ উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত। আবার 'দশরথ জাতক' অনুযায়ী রামপণ্ডিত হলেন বুদ্ধ নিজেই। বৌদ্ধমত যে নতুন কোনোও ধর্ম নয়, সনাতন বৈদিক ধর্ম থেকেই সৃষ্ট একটি মতবাদ, স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন সে কথা। হিন্দু দশাবতারের অন্যতম অবতার হলেন গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার এবং একই বংশজাত শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ— এই তিনটি আলাদা ধর্ম নয় বলেই ভারতবাসী মনে করেন। এগুলি সনাতন হিন্দু ধর্মেরই শাখা।

রবীন্দ্র মানস

'একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাতে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন— সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষের জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।' ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন রবীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ' বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁকে 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' রূপে চিহ্নিত করেছেন, যাঁর মন্দির দর্শনে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। সেই পবিত্র তীর্থে পৌঁছে কবিগুরুর মনে হয়েছিল, 'যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল, তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিনি?'

বুদ্ধদেব তাঁর জন্মমুহূর্তে মহাযুগে আপন স্থান করে নিয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান ক্ষুদ্র কাল সীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হতো। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে',— কিন্তু মানুষ জানতে পারতেন না সেই মহামানবকে যিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বলেই আজ

মহাযোগের বেদীতে, মানবমনের মহাসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মনে হয়েছে মনুষ্যত্বের বিশ্বব্যাপী এই অপমানের যুগে আজ বলবার দিন এসেছে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

ভগবান বুদ্ধের শরণ আমরা কেন নেবো? নেবো একারণেই, তাঁর মধ্যে বিশ্বমানবের এক শাশ্বত সত্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে। যিনি বলতে পারেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে হবে— 'অক্কোধেন জিনে কোধং'। যিনি সদর্থক মুক্তির কথা বলতে পারেন, যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগের মধ্যে, যে মুক্তি সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, বাহুবল মানুষের চরম বল নয়; এই বলে বলীয়ান হয়ে যে জয় আসে তা একান্তই নিষ্ফল, কারণ এক যুদ্ধের জয় দ্বিতীয় যুদ্ধের বীজ বপন করে দেয়। বুদ্ধদেবের অহিংসার বাণীকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে বললেন, 'বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে, প্রতিহিংসাকে জয় করার দ্বারা শান্তি মেলে না। ক্ষমাই আনে শান্তি, একথা মানুষ রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতেই নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে— কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না।'

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে মনে হয় না কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য এই নিদান তিনি দিয়ে গেছেন। কারণ ভারতবর্ষ তো এই আদর্শই চিরকাল অনুসরণ করে এসেছে, আজও অনুসরণ করছে। কিন্তু যে বৃহৎ রাষ্ট্র, যে বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়গুলি হিংসা, পাশবিকতা এবং সমর-কুশলতার সাহায্যে সিদ্ধিলাভের ভয়ংকর দুরাশা করে এসেছে এতকাল, এই বাণী তাদের জন্যও তিনি রেখেছেন। আজ সেই মহামানবকে স্মরণ করার দিনে বিশ্ববাসীও যেন ভারতবর্ষের এই অমৃতের সন্তানকে প্রকাশের দ্বারা আপন মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এবং ভারতবর্ষের বাইরে আস্ফালন করা যাবতীয় ক্রোধী, হিংস্র, পশুবৎ মানুষের ভিড়ে মানবতার পরত লাগানোর মতো জনগোষ্ঠীর উদয় যত দ্রুত আসবে, পৃথিবী ততই মঙ্গলের পথে এগিয়ে যাবে। বিশ্ববাসীর এই বোধিলাভ কবে হবে?

স্বামী বিবেকানন্দের অনুভব

১৮৯৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাসভার ষোড়শতম দিনের অধিবেশনে স্বামীজী বললেন, ''Hinduism cannot live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism... the Buddhists cannot stand without the brain and philosophy of the Brahmins, nor the Brahmin without the heart of the Buddhist. This separation between the Buddhists and the Brahmins is the cause of the downfall of India.'' বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না। হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না। ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনের সাহায্য না নিয়ে বৌদ্ধরা দাঁড়াতে পারে না। বৌদ্ধদের হৃদয়বেগ ছাড়া ব্রাহ্মণরাও বাঁচতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ।

স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'Let us then join the wonderful intellect of the Brahmin with the heart, the noble soul, the wonderful humanising power of the Great Master.' তাই তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশে উদ্যত হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের অভিনব ধীশক্তির সঙ্গে লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা ও অসাধারণ লোককল্যাণশক্তি যোগ করতে। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের হিন্দুধর্মের সঙ্গে একই ছায়ার নীচে আনতে চেয়েছিলেন। 'প্রবুদ্ধ' কথাটির মধ্যে রয়েছেন হিন্দুদের দশাবতারের অন্যতম শেষ অবতার বুদ্ধ (প্র+বুদ্ধ=প্রবুদ্ধ)। তিনি মনে করতেন গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে ভারত জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধমতের সম্মিলন ঘটবে। 'I repeat, Shakya Muni came not to destroy, but he was the fulfilment, the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus.'

হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি :

'আবার প্রবুদ্ধ হও!

এ নিদ্রা, মৃত্যুতে নয়, জীবনেই ফিরাতে আবার,

এ শুধু বিশ্রাম, যাতে চোখে ভাসে নতুন স্বপ্নের

অদম্য সাহস। দেখো, হে সত্য, পৃথিবী চায় তোমাকেই,

তুমি মৃত্যুহীন।'

স্বামীজীর এই অনুভবে প্রতীয়মান হয়, বৌদ্ধমত হিন্দুধর্মেরই শাখা, আলাদা ধর্ম নয়। ◻

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে প্রতাপাদিত্য উৎসব পালনের যৌক্তিকতা

শ্রীমান চক্রবর্তী

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে সমগ্র বঙ্গভূমি মুঘল-পাঠান, মঘ, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়েছিল। তখন বারোভূঁইয়াদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ঈঁশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, কন্দর্পনারায়ণ এবং অবশ্যই ভুলুয়া যশোহরের বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও রাজা প্রতাপাদিত্য। মুঘল-পাঠানদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজ ভূঁইয়াদের প্রতিবেশী আরাকানরাজ, মঘ জলদস্যু ও পশ্চিমি ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বাঙ্গলার স্বাধীন ভূঁইয়াদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন, তিনি ছিলেন ভুলুয়া যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য। সমসাময়িককালে এবং পরবর্তী প্রায় দু'শতাব্দী ব্যাপী পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ইতিহাসে ও নানা প্রবাদের ভিত্তিতে লেখা পুঁথিপত্রে মহারাজা প্রতাপাদিত্য কখনো পূজিত হয়েছেন কিংবা সমালোচিত বা ধিকৃত হয়েছেন। আকবরনামায় ষোড়শ শতকের থেকে বঙ্গদেশে আগত জেসুইট পাদরিদের বিবরণে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা হিসেবে প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতকে আবদুল লতিফের ভ্রমণ কাহিনি এবং প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মির্জা নাথান আলাউদ্দিন ইস্পাহানি লিখিত 'বাহিরিস্তান-ই-ঘায়বী' থেকেও ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গ, বিহার, অসম, ওড়িশায় মুঘলদের যুদ্ধের কথা জানা যায় (A History of Mughal Wars in Assam, Cooch Behar, Bengal, Bihar and Orissa during the reign of Jahangir and Shahjahan, by Mirza Nathan)। এই তথ্যসূত্রে মানসিংহ আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের আদেশে বঙ্গে যে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে প্রতাপাদিত্যের জীবনকাল ও রাজনৈতিক উত্থানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথা জানা যায়।

প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের স্বীকৃতি বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। বর্ধমান প্রদেশের ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া নিবাসী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ বা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র রায়ের আনুমানিক চল্লিশ বছর বয়সে লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে 'বঙ্গজ কায়স্থ' বলে উল্লেখ করেন।

প্রায় দু'শো বছর পর ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে ১৮০১ (শ্রীরামপুর প্রেস) সালে রামরাম বসু তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বীর বাঙ্গালির প্রথম তর্পণ শুরু করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তনী হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার ১৮৫৩ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন কলভিন ও রেভারেন্ড লং সাহেবের অনুরোধে রামরাম বসুকৃত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটিকে সমকালীন বঙ্গভাষায় 'মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামে প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সালে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, ঘটককারিকা থেকেও প্রতাপাদিত্যের সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানা যায়। এছাড়া বিভারেজ লিখিত বাকরগঞ্জের ইতিহাস এবং উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের গভর্নমেন্টের গেজেট, স্টাটিসক্যাল অ্যাকাউন্টে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রচলিত প্রবাদগুলিই স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী অনেক তথ্য সংগ্রহ করে 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতেও অনেক ক্ষেত্রে প্রবাদ ও প্রচলিত গাথাই স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের চরিত্র নিয়ে মূলত সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থ অবলম্বনেই উনিশ শতক ও বিংশ শতকেও রচিত হয়েছে উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও জীবনচরিত।

ঊনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের প্রারম্ভেই বঙ্গের জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে প্রতাপাদিত্যের নাম সকলের নজরে আনেন সরলাদেবী চৌধুরাণী। এরই প্রভাবে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আমাদের 'প্রতাপাদিত্য'। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'— গ্রন্থটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে উৎসর্গ করেন (১৮ই আশ্বিন, ১৩২৯-প্রথম সংস্করণ, বেলফুলিয়া খুলনা থেকে প্রকাশিত)। প্রত্যাপাদিত্য সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। যদুনাথ সরকার 'প্রবাসী' পত্রে আবদুল লতিফের ভ্রমণ কাহিনি ও 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়বী' নামক গ্রন্থ থেকে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জানিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে লিখছেন— ''বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমেই তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে বীর-পুত্রের রণপ্রতাপের প্রতিষ্ঠা চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিবে। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুতে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর। প্রতাপের চরিত্র ও উদ্দেশ্য আমরা নানাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা করিয়াছি— প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়া ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু অরাজকতার যুগে বিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাজন্যবর্গ যখন আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহারা বিদ্রোহী, না যাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং যাহারা পররাজ্য স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত, সেই মুঘলরা বিদ্রোহী? আত্মরক্ষায় প্রতাপের জীবন আরম্ভ; লবণের মর্যাদা রক্ষার জন্য পাঠানের পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরবর্তী সাধনা। দেশ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন; মাৎস্যন্যায় সর্বত্র বিরাজিত; তজ্জন্য শান্তি বা মতের ঐক্য কোথায়ও ছিল না। প্রতাপ বুঝায়াছিলেন যে, আত্ম-প্রাধান্য বা একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, প্রজার বলে এবং ভৌমিকগণের রাজকোষের সাহায্য-ফলে দেশের শত্রু মুঘলকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন করা চাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভুল অনেকের হয়, সকল দেশের ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী। বসন্তরায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল। ইহা হইতে জ্ঞাতি-বিরোধ ও আত্মকলহের সৃষ্টি। যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অনুগত দিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতা তাঁহাকে দুর্বল করিয়া তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নূতন মন্ত্র প্রচারিত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দেশ, কাল ও পাত্র তাঁহার আদর্শের মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।"

কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর শিবাজী মহাকাব্যে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর মুখে বলিয়েছেন— 'নহে বহুদিন গত, শুনি বঙ্গদেশে/প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর/তেজস্বী, স্বধর্মনিষ্ঠ; করিলা প্রয়াস/ স্থাপিত স্বাধীন-রাজ্য। বিপুল বিক্রমে/পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার/বিজিত বিধ্বস্ত কিন্তু হলো অবশেষে;/রাজ্য-সংস্থাপন হলো আকাশ-কুসুম।' তেজস্বিতা, স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টাই তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে। তাঁর পতনের কারণ বোঝাতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, / শুন গূঢ়তত্ত্ব তা'র। তেজোবীর্য্যগুণে/প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনতা লাভে;/কিন্তু তা'র জাতি, দশ না ছিল প্রস্তুত; /জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকূল, তাই হলো ব্যর্থ চেষ্টা।'

প্রচেষ্টার মধ্যে মানুষের পুরুষকার, তার কর্মফল সর্বদাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। তিনশো বছর পর বিংশ শতকের শুরুতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সমগ্র জাতিকে সামরিক বল, নির্ভীক আত্মত্যাগ, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে থাকা বাঙ্গালি নারী সরলাদেবী চৌধুরাণী মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর বীরপুত্র উদয়াদিত্যকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা'-য় তিনি লিখছেন— 'মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল। তার পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসারিত উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রিত্ব করি। আমি ইতিস্তত করতে লাগলুম। পীড়াপিড়ি করাতে আমি একটু ভেবে তাকে বললুম— 'আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রিত্ব করতে যাব— এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যলোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' করো, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের করো কোথায় কোন বাঙ্গালি ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী করো— আর আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে— প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও, পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়। মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি মেডেল উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'atmosphere' তৈরি দেওয়া হলো। মেডেলের ওপর একদিকে খোদা ছিল— 'দেবাঃ দুর্বলর্ঘাতকাঃ'। বিপিন পাল তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়া-তে টিপ্পনী করলেন— 'As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal!' সরলাদেবী লিখছেন— দীনেশ সেন একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দূত হয়ে এসে আমায় বললেন— 'আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন।

প্রতাপাদিত্য কখনো কোনো জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।' আমি দীনেশবাবুকে বললুম— 'আপনি তাঁকে বলবেন, আমি তো প্রতাপাদিত্যের moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি— তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙ্গলার শিবাজী ছিলেন, মুঘল-বাদশার বিরুদ্ধে একতা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাঙ্গলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন— সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোনো ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব। বাঙ্গালির বীরপূজা চলতে থাকল। এবার প্রতাপাদিত্যের পত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। 'Bengalee'-তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বেরতে থাকল। উদয়াদিত্যের উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি এইভাবে লিখলেন— সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন "surprise spring" করছেন— আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হঁফিয়ে পড়ছি।'

বাঙ্গালি সমাজের একাংশ আজও সেদিনের ভবানন্দ মজুমদার, রূপরাম বসু, ভবেশ্বর রায়, কচুরায়, মানসিংহের চরিত্র ধারণ করে সনাতন হিন্দু বাঙ্গালির সর্বশেষ হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমি ও আরবীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের হাতে বিকিয়ে দিতে তৎপর। তাই একথা অত্যুক্তি নয় যে চারশো বছর পরেও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীরগাথা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। □

হিন্দুত্ব বিনষ্ট হলে ভারতের পতন অনিবার্য

অমিত কুমার চৌধুরী

প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রীয়তা থাকে। আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়তা হলো হিন্দুত্ব। তাই হিন্দুত্বই এদেশের রাষ্ট্রীয়ত্ব। হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয়ত্ব সমার্থক। হিন্দু থেকে হিন্দুত্ব এবং রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রীয়ত্ব শব্দের উদ্ভব। কিন্তু এদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন— না, ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়ত্ব হচ্ছে ভারতীয়ত্ব, বহুত্ববাদ, ধর্মনিরেক্ষতা; হিন্দুত্ব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, এদেশে যদি একজনও হিন্দু থাকে তবুও আমি বলবো এটা হিন্দুরাষ্ট্র। কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা হোমরুল লিগ আন্দোলনের নেত্রী, আইরিশ মহিলা অ্যানি বেসান্তেরও মত ছিল— ভারতের মূল প্রোথিত রয়েছে হিন্দুত্বে। হিন্দুত্বরূপী মূলকে উৎপাটন করলে ভারতবর্ষের মৃত্যু হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভারতের আত্মা হচ্ছে ধর্ম, ধর্মকে ভুলে গেলে ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঋষি অরবিন্দও একই কথা বলেছেন অন্য ভাবে— সনাতন (হিন্দু) ধর্মের উত্থান হলেই ভারতের উত্থান আর সনাতন ধর্মের পতন হলেই ভারতের পতন। ভারত ধর্মের দেশ, সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ধর্ম।

হিন্দু : ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতি আর মানুষ সৃষ্টি করেছে সভ্যতা। তাই প্রকৃতি আগে, সভ্যতা পরে। প্রতিটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির সৃষ্টি নদী যাকে আমরা সিন্ধু নদ বলে নামাঙ্কিত করেছি, সেই সিন্ধু নদের তীরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে সিন্ধু সভ্যতা বলে জানি। নদীর দুই পাড়ে গড়ে উঠা সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। সেখানে বসবাসকারী লোকেদের সিন্ধু বা হিন্দু বলা যায়। সেই অঞ্চলকে সিন্ধুস্থান বা হিন্দুস্থান বলা যায়। এদেশে কিছু মানুষের হিন্দু শব্দে ভীষণ অনীহা। তারা বলেন হিন্দু কেন? ভারতীয় নয় কেন? হিন্দু শব্দটি তো বিদেশি, নতুন। মুসলমান আমলে এটা প্রাধান্য পায়। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই বরং ভারতীয় শব্দ প্রাচীন ও স্বদেশী। তাছাড়া হিন্দু শব্দে এদেশের অহিন্দুরা অংশীদার হতে পারে না, হিন্দু শব্দ সংকীর্ণ রূপ ইত্যাদি। পারসিকরা স-এর উচ্চারণ হ করতো। এদেশের প্রাচীন জনজাতিদের কাছে সিন্ধু নদ হিন্দু নামে পরিচিত ছিল। হ-এর সংস্কৃত রূপ হচ্ছে স। সংস্কৃতে স কোনো কোনো প্রাকৃত ভাষায় ভারতীয় ও বিদেশি উভয় ক্ষেত্রেই হ-তে পরিবর্তিত হয়। স-কে হ উচ্চারণ করে তাই অসমীয়ারা সপ্তাহকে হপ্তা বলে। বাঙ্গালিরাও সপ্তাহ-কে হপ্তা বলে কেউ। এখন প্রশ্ন, পারসিকরা সব সময় স-কে হ বলতো কিনা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কেননা পারসিক বা বর্তমানে ইরানের লোকেরা ইসলামকে ইহলাম, শিয়াকে হিয়া বলে কি? বলে না। বেদে সিন্ধু নদের উল্লেখ রয়েছে। সাতটি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু বলা হতো। ভিন্ন উচ্চারণে হপ্তহিন্দু হয়। সেই সাতটি নদী হলো— সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, পরুশল্যা আসিকন্যা ও সিন্ধু। বৈদিক ভারত সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে— 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে, সিন্ধু, কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু'। বার্হস্পত্য শাস্ত্রে হিন্দু শব্দটির ব্যাখ্যা পায়। এইরূপ— 'হিমালয়াৎ সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্। তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে'।। হিমালয় থেকে হিন্দু সরোবর (ভারত মহাসাগর)-এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে হিন্দুস্থান বলা হয়। হিমালয়ের হি আর ইন্দু সাগরের ন্দু থেকে হিন্দু শব্দ হয়েছে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন— 'আসিন্ধু সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারত ভূমিকা। পিতৃভুঃ পুণ্যভূশ্চবঃ স বৈ হিন্দুরিতিস্মৃত'।। অর্থাৎ হিমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ডকে যারা পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি মনে করে তারাই হিন্দু।

হিন্দু শব্দটি একটি ভৌগোলিক নামকরণ, এটি ভূগোল সম্পর্কিত, সিন্ধু নদ থেকে এর উৎপত্তি।

হিন্দু একটি ধর্মের নাম। যারা কালীপূজা, দুর্গা পূজা, শিবরাত্রি, উপবাস, মন্দিরে যাওয়া ইত্যাদি করেন তারা হিন্দু।

হিন্দু একটি সংস্কৃতির নাম। মানুষ যা প্রকট করে তা সভ্যতা এবং তার পেছনে যে মূল্যবোধ বা সংস্কার থাকে তা সংস্কৃতি। হিন্দুশাস্ত্রে একজন নারীকে বিবাহের বিধান আছে। তাই হিন্দুরা স্ত্রী জীবিত থাকাকালে দ্বিতীয় বিবাহ করে না। এটা হিন্দুর সভ্যতা কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ না করার কারণ হিন্দু বিশ্বাস করে মাতৃবৎ পরদারেশু অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া সকল নারী একটি পুরুষের কাছে মাতৃতুল্যা। এটা হিন্দুর সংস্কৃতি।

হিন্দু একটি সভ্যতার নাম। প্রাচীনকাল থেকে যে জীবনধারা আমরা বহন করে চলেছি তা মূলত হিন্দু সভ্যতা। আমরা প্রথমে প্রকৃতি পূজক ছিলাম, ক্রমে সনাতনী, বৈদিক আর্য, দ্রাবিড়, ভারতীয় সমস্ত ধারাকেই এক কথায় হিন্দু সভ্যতা বলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসভায় নিজেকে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন যা হাজার হাজার বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

হিন্দু একটি জাতিরও নাম। ভারতের অপর নাম হিন্দুস্থান, তাই হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের জাতিগত পরিচয় হিন্দু। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী মোহম্মদ করিমভাই চাগলার উক্তি— ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরাও জাতিগতভাবে হিন্দু। দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম আবদুল্লা বুখারি মক্কায় হজ করতে গেলে তাকে হিন্দু বলে ডাকা হয়। বুখারি এতে আপত্তি করলে আরবের মুসলমানরা বলেন মজহব তোমার ইসলাম হলেও তুমি হিন্দুস্থান থেকে এসেছো তাই তুমি হিন্দু।

ভারতে উদ্ভূত যে কোনো একটি ধর্মীয় মতের যিনি অনুসারী তিনি পৃথিবীর যেখানেই বাস করুন না কেন তিনি হিন্দু পদবাচ্য। নোবেল বিজয়ী ভিএস নইপল ভারতে না জন্মেও ত্রিনিদাদে জন্মে, ব্রিটেনের নাগরিক হয়ে, পাকিস্তানি এক নারীর পাণিগ্রহণ করেও তিনি হিন্দু।

ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক অখণ্ড মিলনই হলো হিন্দু। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, শাক্ত, গণপত্য, আর্যসমাজী ও ব্রাহ্ম ইত্যাদি সবারই মূল হিন্দু। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খ্রিস্টান, হিন্দু-ব্রাহ্ম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

১৯৭৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে হিন্দু থেকে কোনো ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলেও সে হিন্দুই থাকে। কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি পার্শি ধর্মাবলম্বী দাদাভাই নৌরজীর মতে, হিন্দু শব্দ জাতীয়তার পরিচায়ক। স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের মতে ভারতের সব মতই হলো হিন্দু। পাকিস্তানের জিয়ে সিন্ধ আন্দোলনের নেতা জেএম সৈয়দ মনে করেন ধর্ম পরিবর্তন করলেও সংস্কৃতি ও জাতীয়তার পরিবর্তন হয় না। ১৯৩৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী একবার ইউরোপে গেলে সেখানকার লোকেরা তাকে প্রশ্ন করেছিল তিনি কোন ধরনের হিন্দু? ইসলাম মতানুসারী হিন্দু না খ্রিস্টান মতানুসারী হিন্দু না বৈদিক ধর্মানুসারী হিন্দু? বিদেশিরা ভারতে বসবাসকারী সকলকেই ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু বলেই জানে। কোরানে কোথাও বলা নেই যে ধর্মান্তরিত হলে পূর্বপুরুষের পরিবর্তন হবে। তাই ভারতের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ বাবর নয়, শ্রীরাম। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানেরা মজহবে মুসলমান হলেও সংস্কৃতিতে হিন্দু। তাই আজও তারা রামায়ণ গান ভক্তিভরে গায়। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রায় গণেশের ছবি এবং বিমান সংস্থার নাম গরুড় এয়ার ওয়েজ।

হিন্দুত্ব তত্ত্বে : ভারতে প্রথম ১৮৯২ সালে এই বঙ্গভূমিতে এক বঙ্গ সন্তান চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন তার সমাজ চিন্তামূলক রচনায়। তার ঊনত্রিশ বছর পর ১৯২১ সালে বীর সাভারকর হিন্দুত্ব নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৫ সালে ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনার মাধ্যমে হিন্দুত্ব শব্দটি আমাদের এই দেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে। হিন্দুধর্মকে বাইরের লোকেরা হিন্দুইজম বলে। ইজম হচ্ছে বাদ বা মতবাদ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ হতে পারে। মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম যথাক্রমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ। এদের— (১) একজন প্রতিষ্ঠাতা, (২) একটি নির্দিষ্ট পুস্তক, (৩) নির্দিষ্ট কিছু রীতিনীতি রয়েছে। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্লমার্কস, দাস ক্যাপিটাল নির্দিষ্ট পুস্তক এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখল করে সমাজ পরিবর্তন। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ, কোরান নির্দিষ্ট পুস্তক এবং মসজিদে আজান দেওয়া নামাজ পড়া, ফেজ টুপি পরা রোজা রাখা তাদের রীতিনীতি। হিন্দুধর্ম সেই অর্থে কোনো শব্দ বা ইজম নয়। হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে তা জানা নেই। আর রয়েছে পুস্তক অগুনতি, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা।

পূজা পদ্ধতিও প্রচুর যেমন— দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ যে যাকে মনে করেন তাকে মানেন বা পূজা করেন। এই কারণে কিছু মানুষ বলেন যে হিন্দু কোনো ধর্মই নয়। তাহলে হিন্দু কী? গণিত, পদার্থবিদ্যা রসায়ন শাস্ত্রের কোনো একজন প্রতিষ্ঠাতা আছে? নির্দিষ্ট একটি পুস্তক আছে? এই তিন বিষয়ের নিয়ম রীতি কি এক? তবুও এগুলি জ্ঞানভাণ্ডার, মানব সভ্যতায় এগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। ঠিক সেই রকম প্রাচীনকাল থেকে বহু ঋষি, মুনি, সাধক, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের সাধনালব্ধ জ্ঞান যা মানব কল্যাণে লেগেছে সেইগুলো তারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিভিন্ন পুস্তকে। হিন্দুধর্ম কখনোই বলেনি আমি বা আমার গ্রন্থে যা লেখা আছে তা তোমাকে মানতেই হবে না হলে তুমি বধযোগ্য। তাই হিন্দু ধর্মে এত বৈচিত্র্য। হিন্দুরা এই ধর্মকে মেনে চলে বলে এর নাম হিন্দুধর্ম যা আসলে সনাতন ধর্ম, যা অতীতে ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। ধর্মের প্রতিশব্দ কোনো ভাষাতেই নেই। ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ রিলিজিয়ন করা হলেও রিলিজিয়ন বলতে যা বোঝায় সনাতন ধর্ম বলতে তা বোঝায় না। তাই হিন্দু বা সনাতন ধর্মই হলো ধর্ম, আর ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি সবগুলো মতবাদ বা সম্প্রদায়। হিন্দু একটি জীবন দর্শন, একটি জীবনধারা। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে হিন্দু কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং এই শব্দের দ্বারা নিষ্ঠাবান হয়ে সত্য সন্ধানী ব্যক্তি সমূহের একটি সাধারণ মঞ্চকেই বোঝায়। হিন্দু জীবনধারাকে,

জীবন দর্শনকে হিন্দুত্ব বলা হয় যা সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃতি দিয়েছে। হিন্দুধর্ম বিশ্বমানব ধর্ম। হিন্দুধর্ম বলেছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, স্বদেশ ভুবনত্রয়ম, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ।

হিন্দুত্ব প্রকাশে : জাতীয় নীতিবাক্য (১) ভারতের সংবিধানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার ছবি আছে। (২) ভারত সরকার— সত্যমেব জয়তে, (৩) লোকসভা— ধর্মচক্রপ্রবর্তনায়, (৪) সুপ্রিম কোর্ট— যতো ধর্মোস্ততো জয়ঃ, (৫) দূরদর্শন— সত্যম শিবম সুন্দরম্, (৬) সামরিক বাহিনী— সেবা আস্মাকং ধর্ম, (৭) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ— সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। এইসব কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া ও সংস্কৃত ভাষায়।

রাষ্ট্র : রাষ্ট্র শব্দের অর্থ জানার আগে দেশ, রাজ্য ও রাষ্ট্র এই তিনটি শব্দের পার্থক্য জানা প্রয়োজন। দেশ ভৌগোলিক, রাজ্য রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক ধারণা। আমি বিদেশে থাকলে বলবো ভারত আমার দেশ, দিল্লিতে থাকলে বলবো পশ্চিমবঙ্গ আমার দেশ, কলকাতায় থাকলে বলবো মুর্শিদাবাদ আমার দেশ, তারপর বলবো বহরমপুরে আমার জন্ম। সাধারণত জন্মস্থানের সঙ্গে দেশ কথাটি যুক্ত থাকে, যেখানে আমি লালিত পালিত হয়েছি সেই গ্রাম বা শহর যেমনি হোক না কেন তার সঙ্গে এক প্রাণের টান অনুভূত হয়। রাজ্য রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক একক, যা সরকার কেন্দ্রিক। ভারত একটি রাজ্য আবার বিহার একটি ভারতের অঙ্গ রাজ্য। ইংরেজি ভাষায় State কথাটির অর্থ রাজ্য ও রাষ্ট্র দুই। যেমন West Bengal State Transport Corporation, এর অর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। West Bengal State Electricity Board, এর অর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। এখানে State কথার অর্থ রাজ্য ও রাষ্ট্র দুই। তাহলে রাজ্য রাষ্ট্র কি এক?

না, রাষ্ট্র শব্দের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আবেগ জড়িয়ে থাকে। আগে পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি দুটি পৃথক দেশ বা রাজ্য ছিল কিন্তু রাষ্ট্র এক, কারণ দুই দেশের সংস্কৃতি এক। তেমনি উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া দুটি পৃথক রাজ্য কিন্তু একই রাষ্ট্র। ভারত ও নেপাল দুটি পৃথক রাজ্য বা দেশ কিন্তু দুই দেশের সংস্কৃতি এক, তাই রাষ্ট্র এক। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাতায় state বা রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে। রাষ্ট্র হলো কিছু সংখ্যক মানুষকে নিয়ে গঠিত এক জনসমাজ যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, যার একটি সার্বভৌম সরকার আছে এবং সেই সরকারের প্রতি জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য থাকবে এবং যার স্থায়িত্ব আছে ও বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুখ্যত চারটি ও গৌণত দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (২) জনগণ, (৩) সরকার, (৪) সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা। গৌণ দুটি, (৫) স্থায়িত্ব, (৬) বৈদেশিক স্বীকৃতি। কোনও একটা ভূখণ্ডে যখন একটি জনসমাজ দীর্ঘকালব্যাপী বসবাসের ফলে এক প্রবাহমান সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ে চলার ফলে ওই জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে একাত্মবোধ অনুভব করে তখনই রাষ্ট্র হয়। বর্তমান রাজনৈতিক ভারতের সীমানা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ও গুজরাট থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত। কিন্তু সাংস্কৃতিক ভারত, বর্তমান ভারত ছাড়াও আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি অতীতে এই বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশে শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতিই বিদ্যমান ছিল, তাই ভারতও এক রাষ্ট্র ছিল। অনেকেই বলবেন ভারত এক রাষ্ট্র ছিল না কারণ কোনোকালেই এক শাসনের অধীনে এই বিশাল ভূখণ্ড ছিল না। মৌর্য, গুপ্ত, মোগল আমলেও এক শাসনাধীন ছিল না।

ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তারা রাজ্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করতো ঠিকই, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তেমন শত্রুতা ছিল না। বঙ্গদেশের মানুষ গুজরাটের দ্বারকায় চলে যেত তীর্থ করতে আবার কাশ্মীরের মানুষ তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে গিয়ে ভক্তি ভরে পূজা করতো। তখনোও ভারতের ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভাষী মানুষেরা সমগ্র ভারতভূমিকেই নিজ দেশ বলে মনে করতো যার সূত্র ছিল হিন্দু সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ। এই হিন্দু সংস্কৃতি থেকে বহু মানুষ আমাদের দুর্বলতার কারণে চলে যাওয়ার ফলে প্রাচীন বিশাল ভারত আজ খণ্ড বিখণ্ড। কিছুদিন আগে বলিউডের এক অভিনেতা বলেছিলেন ব্রিটিশ আগমনের আগে ভারত বলে কিছু ছিল না প্রত্যুত্তরে আরেক অভিনেত্রী বলেছিলেন যে ভারত না থাকলে মহাভারত এলো কোথা থেকে?

রাষ্ট্রীয়তা : ইংল্যান্ডের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তা ইংরেজত্ব, জার্মানির জার্মানিত্ব, ফ্রান্সের ফরাসিত্ব ঠিক তেমন ভারতের রাষ্ট্রীয়তা ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব দর্শন ভারতে উদ্ভূত যা সৃষ্টি করেছে হিন্দুসমাজ। ভারত একটি দেশ বা ভূখণ্ড আর হিন্দু একটি সমাজ। রবীন্দ্রনাথের মতে— বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহা বিচার্য। ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয়টি হলো সমাজ আর সেই সমাজ একান্তভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি হলো দেবাশ্রয়ী ধর্ম যাকে ধারণ করে গড়ে উঠা জীবন চর্যাই হলো হিন্দুত্ব। এক নারী বিবাহের পর গর্ভবতী হলে তাকে স্বাদ খাওয়ানো হয়, সন্তান জন্মের পর অন্নপ্রাশন ও হাতেখড়ি হয়, বাড়ি তৈরি করার সময় ভূমি পূজন হয়, বিবাহ অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচার হয়, পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ হয়, পরে পিণ্ডদান হয়। হিন্দু সমাজে জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পরও সব আচার অনুষ্ঠান ধর্মাশ্রয়ী। ১৯৫৭ সালে কেরালায় নাস্তিক কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ চীনে আমন্ত্রিত হয়ে মাও-সে-তুং-এর জন্য নটরাজের একটি মূর্তি উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মনের মণিকোঠায় অজান্তে ভারতীয়ত্ব জেগে উঠে ছিল যা হিন্দুত্ব। জওহরলাল নেহরু অজ্ঞেয়বাদী ও হিন্দুত্ব বিরোধী ছিলেন। তবুও মৃত্যুর আগে আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম যেন প্রয়োগের সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া হয়। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, সনাতন ধর্মের উত্থান হলে ভারতের উত্থান আর সনাতন ধর্মের পতনে ভারতের পতন। □

আবোলতাবোল খেলা

নিলয় সামন্ত

আগেও লিখেছি এখনও লিখছি, বিশ্বের কোথাও একই টুর্নামেন্টে দুটো ট্রফি দেওয়ার প্রথা নেই। কিন্তু আইএসএলে আছে। লিগে হেরে যাওয়া মুম্বই সিটি এফসিকে যেন আর একটা ফাইনাল খেলার সুযোগ করে দেওয়া হলো। আর তাদের জেতানোর জন্য খারাপ খেলল মোহনবাগান। গড়াপেটা কিনা প্রমাণ করা যাবে না। তবে আমার সিনিয়ার জার্নালিস্টরা কী বলছেন একবার দেখে নেওয়া যাক।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক শ্যামসুন্দর ঘোষ তাঁর ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, মুম্বই সিটির কাছে আইএসএলের দুনম্বরি ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছে। এই ফাইনাল খেলার কোনো গুরুত্ব নেই ভারতীয় ফুটবলে সে কথা গত দুদিন তথ্য দিয়ে একাধিকবার লিখেছি। কিন্তু এখন তো সংবাদপত্রে পাঠকের কাছে দায়বদ্ধতা, পেশার প্রতি সততা, সেসব তো অনেক আগেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। এখন মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাটাই সংবাদপত্রে টিকে থাকার মন্ত্র। তাই মোহনবাগান নামটা এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সঙ্গে ত্রিমুকুট জয়ের কথা বলা হচ্ছে।

ব্যাঙ্গালোরের বর্ষীয়ান ফুটবল সমালোচক বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীকুমার আমায় ফোন করেছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ব্যাঙ্গালোরের স্পোর্টস এডিটর ছিলেন, কলকাতার টাইমস অব ইন্ডিয়ায় কাজ করেছেন। পুরনো যে কয়েকজন ফোন করে কেমন আছি জানার চেষ্টা করে শ্রীকুমার তাদের মধ্যে একজন। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কীভাবে মোহনবাগানের খেলাকে লিগ ফাইনাল বলা হচ্ছে। লিগে তো চ্যাম্পিয়নশিপের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে?

ওর প্রথম প্রশ্ন ওই খেলায় কে জিতেছে জানো? আমি হেসে বললাম বলো? ও বলল, মুম্বই দল।

সংবাদপত্র খুলে দেখলাম মুম্বই জিতেছে। সেদিন তিনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গে তিনি একই মত পোষণ করেন। এদেশের ফুটবল কে চালাচ্ছে?

শ্রীকুমারের বক্তব্যের সঙ্গে আনন্দবাজারে শ্যাম থাপার লেখা পড়লে মনে হয় ওই খেলাটা গড়াপেটা ছিল। শ্যাম থাপা ম্যাচ রিপোর্টে শুরুতেই লিখেছেন, শেষ কবে মোহনবাগানকে এত বিশ্রী ফুটবল খেলতে দেখেছিলাম, মনে করতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ধর্মশালায়। সন্ধ্যে হতেই টেলিভিশনের সামনে বসে পড়েছিলাম দুর্দান্ত একটা ম্যাচ দেখার আশা নিয়ে। কিন্তু দিমিত্রি পেত্রাতস, জেসন কামিংস, লিস্টন কোলাসোদের যে দিশাহীন ফুটবল দেখলাম, তার পরে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি।

আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের দল কি আদৌ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মনোভাব নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নেমেছিল, সেই প্রশ্নটাই তাড়া করছে আমাকে। সত্যি বলতে, মুম্বই সিটি এফসি পুরো ম্যাচে যতগুলো গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল, তার সবকটা কাজে লাগাতে পারলে এই ফাইনালের ফল তো হওয়া উচিত ৬-১। আমি কিন্তু মোহনবাগান ফাইনালে ওঠার পরেই বলেছিলাম, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে মুম্বইয়ের ত্রয়ীকে থামানোর উপায় খুঁজে বার করতে হবে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো।

ম্যাচের প্রথম ৪০ মিনিট মুম্বই যে ফুটবল খেলেছে, তার দিশা-ই পায়নি মোহনবাগান। বুঝলাম না, মনবীর সিংহের মতো স্ট্রাইকারকে কেন নীচ থেকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিলেন হাবাস? ঠিক যেমন অজানা রয়ে গেল, কেন মাঝমাঠে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া জনি কাউকোকে সচল করতে অনিরুদ্ধ থাপা ও লিস্টন কোলাসোকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিলেন না তিনি? মোহনবাগানের পক্ষে ফাইনালে একটাই জাদু-মুহূর্ত এসেছিল। দিমিত্রির দূরপাল্লার জোরালো শট মুম্বই গোলকিপার লাচেনপা হাত দিয়ে থামাল। ছিটকে বেরিয়ে আসা বল জালে জড়িয়ে দেয় কামিংস।

ঘরের মাঠে এমন একটা পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল আরও আক্রমণাত্মক খেলার, যাতে মুম্বই পালটা ঘুরে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু কাউকো নিষ্প্রভ থাকায় একটা বলও পেল না দিমিত্রি বা কামিংস। রক্ষণ ও মাঝমাঠের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া না থাকার সুযোগই একশো শতাংশ কাজে লাগিয়ে গেল মুম্বই। নেপথ্যে সেই মুম্বই-ত্রয়ী। দুটো উইং দিয়ে দৌড় শুরু করে দিল ছাংতে আর পরিবর্ত হিসেবে নামা বিপিন। মাঝখানে আর্জেন্টিনীয় জর্জ দিয়াস। পিছন থেকে বিক্রমপ্রতাপ সিংহ।

আমার কেমন যেন মনে হলো, মুম্বই দলের ফুটবলের ধরনকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেননি হাবাস। কিংবদন্তী প্রয়াত কোচ প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের ম্যাচে গোল পেলেই দলকে নির্দেশ দিতেন, প্রতিপক্ষকে মাঝমাঠের উপরে কোনও অবস্থায় উঠতে দিয়ো না। হাবাস সেই পথেও হাঁটতে পারলেন না, আবার দলকে পালটা আক্রমণের উপায়ও ধরিয়ে দিতে পারলেন না। একটা পরিসংখ্যানেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। মুম্বই পুরো ম্যাচে নিজেদের মধ্যে ৫৩২টি পাস খেলেছে, সেখানে মোহনবাগান ৪২০। বল নিয়ন্ত্রণ ছিল ৫৭.৪ শতাংশ। অর্থাৎ এই যুবভারতীতে ১৯ দিন আগে হারের পরে মুম্বই নিজেদের যতটা গুছিয়ে নিয়েছে, মোহনবাগানে সেই ব্যাপারটাই ছিল না। ত্রিমুকুট তো হলো না। দেখলাম চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুম্বই সিটি ভারত সেরা। কীভাবে সেটা হলো পাঠকরা বুঝে নিন। □

মানুষের মতোই কৃষিজমিরও প্রয়োজন বিশ্রাম

সফল কৃষকের সাফল্যের চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সাধারণভাবে কৃষকরা তাদের জমিতে প্রতি বছর তিনটি বা চারটি ফসল চাষ করেন। কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার তারা জমিতে প্রয়োগ করে থাকেন। কৃষিকাজের এই ধারণা ও প্রচলিত পদ্ধতির বিপ্রতীপে, স্বল্পসংখ্যক কিছু কৃষক কৃষিক্ষেত্রে চালু এই প্রক্রিয়াকে কৃষিজমির ওপর নির্যাতন বলে মনে করেন। সেই ব্যতিক্রমী কৃষকদের মধ্যে একজন হলেন মগনভাই হামীরভাই আহির।

গুজরাটের কচ্ছ জেলার অঞ্জার মহকুমার নীঙ্গাল গ্রামের অধিবাসী মগনভাই। কৃষিকাজের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনাকরে তিনি বলেন, 'জমিকে কৃষকদের দাসী মনে করা এবং দাসীর মতো তাকে দিন-রাত পরিশ্রম করিয়ে ফসল ফলানো অনুচিত। দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করার পর মানুষের যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তেমনই একটি ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর কৃষিজমিরও কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। কৃষিকাজে বিরামের দরুন জমির জমির উর্বরতা শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে একটি ঋতুতে ফসল বপন, উৎপাদন এবং ফসল কাটার পর তার পরের ঋতুতে জমিতে আমি কোনো ফসল চাষ করি না।'

কৃষিজমিকে বিশ্রাম দেওয়ার ক্ষেত্রে মগনভাই একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সূর্য প্রতি বর্গসেন্টিমিটার জমিতে প্রতি মিনিটে ২ থেকে ২.৫ ক্যালোরি শক্তি সরবরাহ করে। জমি কিছুদিন ফাঁকা থাকলে, সূর্য প্রেরিত সেই শক্তি জমি পুরোপুরি সংগ্রহ করতে পারে এবং সেই শক্তি জমিতে ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে। এই শক্তি সংগ্রহের ফলে জমির উর্বরতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়াই বিপুল পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হয়। জমিকে বিরাম-বিশ্রাম দিলে কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না।

মগনভাই আরও বলেন যে, একটি ঋতুতে কৃষিজমি খালি থাকলে, সেখানে চাষ না হলে, ফসল না ফললে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন— এই ধারণা ভুল। আমরা ভুলে যাই যে ফসল না বোনার এবং জমি ফাঁকা থাকার কারণে বীজ, খেতমজুরদের মজুরি, জমিকর্ষণ, জলসেচ বাবদ খরচের সাশ্রয় হয় চাষিদের। একটি ঋতু ছেড়ে পরের ঋতুতে চাষ করার ফলে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, তা আগের ঋতুতে চাষ না করা অভাবকে পুষিয়ে দেয়।

কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী ও অনন্য আদর্শের অধিকারী মগনভাই ২০ একর জমিতে গম, চিনাবাদাম, মুগ, বাজরা, আখ, আম, ফুটি, রেড়ি ইত্যাদি চাষ করে চলেছেন। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ফসলের খোসা ও অবশিষ্টাংশ দিয়ে তৈরি সার, নিম ও রেড়ি দিয়ে তৈরি অয়েলকেক বা জৈব কীটনাশক এবং জলাশয় ও জঙ্গলের মাটি তিনি চাষের জমিতে প্রয়োগ করে থাকেন। গোবরের জন্য তার ২০টি গোরু রয়েছে। যে কোনো ফসলের বীজও তিনিই তৈরি করে নেন।

৬৪ বছর বয়সি মগনভাই ২০ বছর বয়স থেকে চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত। অন্য চাষিদের মতো প্রথমদিকে তিনি সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষিকাজ চালিয়ে গেলেও ২০০০ সালের পর, অর্থাৎ এই ২৪ বছর ধরে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্যরকম পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছেন।

সমাজ সংস্কারক শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ শাস্ত্রীর ভক্ত কৃষিজীবী মগনভাই— শাস্ত্রীজী প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধ্যায় পরিবার' হতে লাভ করেন কৃষিকাজের যাবতীয় প্রেরণা ও জীবনদর্শন। মগনভাইয়ের এই অনন্য কৃষিকাজের বিবরণ ভারতীয় কৃষক সমাজকে আগামী দিনে প্রাকৃতিক ভারসাম্যযুক্ত, পরিবেশবান্ধব, সুষম, জৈব ও গো-ভিত্তিক কৃষিকাজে অবশ্যই উৎসাহিত করবে। □

রাজকুমারের করুণা

কপিলাবস্তুর মনোরম উদ্যান। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই উদ্যানে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কী যেন ভাবছেন। দেখলেন এক ঝাঁক

রাজহাঁস উড়ে চলেছে। হঠাৎ একটি রাজহাঁস তিরবিদ্ধ হয়ে রাজকুমারের কাছে এসে পড়ল। যন্ত্রণায় রাজহাঁসটি ছটফট করছে। তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তারপর তার সেবা শুশ্রূষা করে একটু সুস্থ করে তুললেন।

খানিক পরেই রাজকুমারের জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত এসে বলল, রাজহাঁসটি তাকে দিতে হবে, কেননা সেই-ই হাঁসটিকে তিরবিদ্ধ করে মাটিতে ফেলেছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন, সে আহত হাঁসটির প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাই হাঁসটির অধিকার তাঁর। বিনিময়ে দেবদত্ত রাজ্য, সিংহাসন সব নিতে পারে। কিন্তু হাঁসটিকে তিনি দেবেন না। তাঁরা দুজনে তর্ক করতে করতে রাজার কাছে পৌঁছলেন। সব শুনে মহারাজা শুদ্ধোধন বললেন, আগামীকাল রাজদরবারে এর মীমাংসা হবে।

পরদিন রাজদরবারে নরম গালিচার উপর হাঁসটিকে রাখা হয়েছে। সভাসদরা তাদের আসনে বসে রয়েছেন। সবাই উদ্‌গ্রীব । যথাসময়ে মহারাজা এসে সিংহাসনে বসলেন। দুই কুমারও তাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

মহারাজা প্রথমে কুমার দেবদত্তকে বললেন, রাজহাঁসটিকে তুমি তিরবিদ্ধ করেছ তাই ওটা তোমারই প্রাপ্য। তুমি রাজহাঁসটিকে নিয়ে যেতে পারো।

কুমার দেবদত্ত তার আসন থেকে হাঁসটির দিকে অগ্রসর হতেই সেটি ভয়ে চিৎকার করে উড়ে গিয়ে কুমার সিদ্ধার্থের কোলে বসল। সিদ্ধার্থ পরম যত্নে হাঁসটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

মহারাজ বললেন, কুমার দেবদত্ত, থামো। হাঁসটির অধিকার তোমার নয়। অধিকার কুমার সিদ্ধার্থের। মনে রেখো, প্রাণ নেওয়া সহজ কিন্তু প্রাণ দান করা কঠিন। কুমার সিদ্ধার্থ পরম মমতায় এই কঠিন কাজটিই করেছে।

সভাসদরা সাধু সাধু বলে উঠলেন। কুমার সিদ্ধার্থ রাজহাঁসটিকে বুকে করে বাগানে নিয়ে গিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে কুমার সিদ্ধার্থই হয়ে ওঠেন করুণার প্রতিমূর্তি, সর্বকালের সর্বযুগের মহামানব। হয়ে ওঠেন ইতিহাসের এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, হয়ে ওঠেন গৌতম বুদ্ধ, তথাগত বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ। মানুষকে তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। হয়ে উঠেছিলেন এশিয়ার আলো।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

নদ-নদী পরিচয়

ইছামতি নদী

ইছামতি নদী ভারত-বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদী। মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলার মাজদিয়ার কাছে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ইছামতি নামে পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে উনিশ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে সাড়ে পঁত্রিশ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে আবার নদীয়ার দত্তফুলিয়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীতে মিলিত হয়। বনগাঁ, বসিরহাট, টাকি শহর ইছামতির নদীর তীরে অবস্থিত।

এসো সংস্কৃত শিখি-২৩

भवत: । আপনার। (পুং) **कस्य** ? কার?
भवत: धनम् । – **আপনার টাকা।**
भवत: यानम् । –**আপনার গাড়ি।**
অভ্যাস করি –
कस्य **गृहम्** ?– भवत: **गृहम्** ।
कस्य माता ?–भवत: माता।
कस्य उपनेत्रम् ? –भवत: उपनेत्रम्
कस्य दन्तकुर्च ? भवत: दन्तकुर्च।
कस्य हस्त: ? भवत: हस्त।
कस्य नासिका ? भवत: नासिका।
প্রয়োগ –
भवत: দিয়ে বাক্য বলা অভ্যাস করতে হবে। (২০টি)
কেবলমাত্র পুংলিঙ্গে **भवत:** হবে।

ভালো কথা

টুনটুনি ছানার কেরামতি

কদিন আগে খুব গরম পড়েছিল। তাই আমরা ঘরের দরজা-জানালা সবসময় খুলে রাখতাম। সেদিন আমার বাবা যখন আমাকে পড়াচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একটি টুনটুনি ছানা জানালা দিয়ে উড়ে এসে বাবার হাতে এসে বসল। তারপরেই উড়ে খাটের তলায় চলে গেল। আমি ওটাকে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেবো ভেবে যেই ধরতে গেলাম অমনি বারান্দার সানসেটে রাখা একটা ব্যাটারির খোলের উপর বসল। বাবা সিড়ি দিয়ে উঠে ধরতে গেলে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছিল। তারপর একসময় খোলা দরজা দিয়ে উড়ে বাইরে চলে গেল।

শিবম রায়, পঞ্চম শ্রেণী, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল মৃ কা ত্যু
(২) কা ল ক্ব অ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র ল্যা অ ণ ক ক
(২) অ থা কূ পা ল র

৬ মে সংখ্যার উত্তর
(১) করুণাসিন্ধু (২) খবরদার

৬ মে সংখ্যার উত্তর
(১) চলচ্চিত্রাভিনয় (২) উপপ্রধানমন্ত্রী

উত্তরদাতার নাম
(১) রূপসা রায়, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা (৩) প্রিয়ম বিশ্বাস,বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। (৪) দেবলীনা রায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে বাম-ইসলামিক অপপ্রচার

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

গত ১২ এপ্রিল নিউজ ওয়েবসাইট মুসলিম মিরর সৈয়দ আলি মুজতবার একটি নিবন্ধ পোস্ট করেছে, যার শিরোনাম হলো— 'একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আরবিআই-কে দেউলিয়াপনার দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছেন।' এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের নাম— বিজয় ঘোরপাড়ে। ২০২২ সালে এই অর্থনীতিবিদের তরফে করা কিছু মন্তব্যের ভিত্তিতে একজন জেহাদির লেখা এই নিবন্ধটিকে বামেরা লুফে নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে অপপ্রচার শুরু করেছে। মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিকভাবে বামেরা বিলীন হয়ে গেলেও ইন্ডি জোটের অন্তর্গত তাদের সহযোগী দলগুলি এই অপপ্রচারে সমান তৎপর। আলি মুজতবার লেখা নিবন্ধটি একটি ডাহা মিথ্যা। এই নিবন্ধের বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে এই মিথ্যা প্রচারটিকে বেআব্রু করার উদ্দেশ্যেই এই লেখার অবতারণা। উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে নিবন্ধের অংশ সমূহ উল্লেখিত হয়েছে এবং তারপরে তা যুক্তিসহ খণ্ডিত হয়েছে।

অভিযোগ : ''২০২৪-এর নির্বাচনের জন্য মোদী সরকার আরবিআই থেকে ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা নিয়েছে এবং বর্তমানে আরবিআই-এর রিজার্ভ ৩০,০০০ কোটিতে নেমে এসেছে। ২০১৪ সালের আগে আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) তহবিল থেকে সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত অর্থ বা আরবিআই-এর মোট লাভের অঙ্কের সমপরিমাণ অর্থ কোনো সরকারই নেয়নি। আগের সরকারগুলি কেবলমাত্র আরবিআইয়ের লভ্যাংশের একটি অংশ নিয়েছে। কিন্তু মোদী সরকারের এই বিশাল পরিমাণ আর্থিক আদায় আরবিআই-কে লোকসানে ফেলে দিয়েছে। ২০১৮ সালে যখন উর্জিত প্যাটেল আরবিআই-এর গভর্নর ছিলেন তখন মোদী সরকার আরবিআই-এর কাছে সমস্ত লাভের টাকা দাবি করলেও প্যাটেল তা প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করেছিলেন। মোদী সরকার তখন প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর বিমল জালানের সভাপতিত্বে ৬-সদস্যের কমিটি গঠন করে, যা আরবিআই তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

আগে আরবিআই দ্বারা প্রদত্ত সর্বাধিক আর্থিক অঙ্ক ছিল প্রায় ৫০-৫৫ হাজার কোটি টাকা যা ছিল আরবিআই-এর লভ্যাংশের একটা অংশ। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়, ইন্দিরা গান্ধী সরকার আরবিআই-এর থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা দাবি করলেও, আরবিআই তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে ৫০ হাজার কোটি টাকা দেয়। বিজয় ঘোরপাড়ে বলেছেন, আরবিআই-এর বর্তমান অবস্থা এতটাই খারাপ যে প্রত্যাশিত লাভ অর্জনের লক্ষ্য তাদের অধরা এবং অর্জিত সামান্য লাভের সবটুকুই নিয়ে নেয় কেন্দ্র। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ২০০৪-২০১৪ পর্বের সঙ্গে মোদীজীর ২০১৪-২০২২ পর্বের তুলনা করলে বলা যায় যে মনমোহন সরকার তার ১০ বছরে আরবিআই-এর থেকে ১,০১,৬৭৯ কোটি টাকা নিয়েছিল। মোদীজীর আমলে এই পরিমাণ ৫,৭৪,৯৭৬ কোটি টাকা যা মনমোহন সরকারের গৃহীত অর্থের পাঁচগুণ বেশি।''

খণ্ডন : সরকার প্রদত্ত জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, দেশের আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায়সঙ্গতভাবেই আরবিআই-এর থেকে উচ্চতর হারে লভ্যাংশ দাবি করে থাকে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আরবিআই-এর তরফেও নির্ধারিত থাকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা। তাই আপৎকালের জন্য তাদের তরফে আর্থিক লাভের একটি বড়ো অংশ সঞ্চয়ের পরিকল্পনা থাকে।

রিজার্ভ ব্যাংক কত রিজার্ভ ধরে রাখবে এবং সরকারকে কতটা দেওয়া হবে? ২০১৯ সালে জালান কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। আরবিআই আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী, 'অনাদায়ী ঋণ, অনুৎপাদক ঋণ (ব্যাড লোন ও এনপিএ), সম্পদের অবমূল্যায়ন (ডেপ্রিশিয়েশন), কর্মীদের জন্য ব্যয়, অবসরপ্রাপ্তদের জন্য তহবিল সংস্থান এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সংস্থান এই আইন দ্বারা বা এই আইনের অধীনে করতে হবে। ব্যাংক আধিকারিকরা সাধারণত এই আর্থিক সংস্থান করবেন এবং এই সমস্ত করার পরে আর্থিক লাভের অবশিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হবে।' ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, জার্মানির ডয়েশ বুন্দেস ব্যাংক, ব্যাংক অব জাপানের মতো শীর্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি যে আইনগুলি তারা চালিত হয়, সেই আইনগুলিতে এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফে অর্জিত আর্থিক মুনাফা সংশ্লিষ্ট সরকারি কোষাগারে হস্তান্তর করতে হবে। লাভের কত অংশ কোষাগারে জমা করা হবে তাও আইন মাফিক নির্দিষ্ট করা আছে। রঘুরাম রাজন আরবিআই গভর্নর থাকাকালীন ওয়াই এইচ মালেগামের নেতৃত্বাধীন কমিটি আরবিআইয়ের আর্থিক লাভের ১০০ শতাংশ হস্তান্তরের সুপারিশ করেছিল।

জালান কমিটি মূলধন কাঠামো (ক্যাপিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার), বিধিবদ্ধ সংস্থান (স্ট্যাটিউটরি প্রভিশনিং), আরবিআই-এর ব্যালেন্স শীট সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, অনুদ্ধারকৃত লাভ (আনরিয়েলাইজড প্রফিট), আর্থিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক মান বিবেচনা করে মোট ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তরের প্রস্তাব করে। এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১.২৩ লক্ষ কোটি টাকার রিজার্ভ (উদ্বৃত্ত) এবং বছরের পর বছর ধরে করা অতিরিক্ত সংস্থান (অ্যাডিশনাল / এক্সেস প্রভিশনিং)-এর ৫২,৬৩৭ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রথম আরবিআই এত বড়ো পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আরবিআই যতটা পরিমাণ রিজার্ভ (উদ্বৃত্ত) বা মূলধন (ক্যাপিটাল বাফার) ধরে রাখছে তা বিশ্বব্যাপী অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

ফঃ ৬

তুলনায় অনেক বেশি। একারণে পরিকাঠামো প্রকল্প এবং সামাজিক খাতের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সরকারের জনকল্যাণমূলক ব্যয় যাচ্ছে কমে, আর্থিক ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে উঠছে কঠিন। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ঋণদানের সুযোগ হচ্ছে সংকুচিত। আবার ঋণদান বাড়লে সুদের হারেরও বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। জালান কমিটির প্রস্তাবনা অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় লভ্যাংশ বণ্টনের ফলে পরবর্তী বছরগুলিতে লভ্যাংশ হস্তান্তর আরও স্বচ্ছ ও নিয়মভিত্তিক হবে, অন্যান্য দেশগুলির সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো ভারত সরকার ও আরবিআই-এর মতপার্থক্য কমবে। এই তহবিল সরবরাহের ফলে নির্দিষ্ট সরকারি প্রকল্পের চাহিদা মিটবে, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটবে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।

অভিযোগ : ''ওই বামমনস্ক অর্থনীতিবিদ জানান যে গত ৬ মাস যাবৎ মুদ্রাস্ফীতি সূচক বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে চলেছে দ্রুত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আরবিআইকে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি। এর কারণ হলো আরবিআই-এর পরিচালন বোর্ড সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে। এই বোর্ড সরকারি নীতিকে সমর্থন করার জন্য পারস্পরিক দোষারোপের পালা সমাপ্ত হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অপরাধ ও নিয়মতান্ত্রিক দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ এহেন একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির হাল অত্যন্ত খারাপ বলে দাবি করে এই অর্থনীতিবিদ সতর্ক করেছেন যে গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে ভারতের অবস্থা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তুলনীয়। তবুও এই দেশে কেউই সরকারের অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না, কারণ মোদী সরকার চায় যে দেশের মানুষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চিন্তা না করে হিন্দুধর্ম রক্ষায় নিয়োজিত থাকুক। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে ভারতের ডুবন্ত ব্যাংকগুলিকে বাঁচাতে ব্যর্থ আরবিআই। লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংক, ইয়েস ব্যাংক, ডিএইচএফএল সবেতেই লালবাতি জ্বলেছে। লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংককে সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ইয়েস ব্যাংক ও ডিএইচএফএল বেসরকারীকরণের পথে। এই অর্থনীতিবিদ আরও জানান যে মোদী সরকার কেবল মাত্র কেন্দ্রের স্বার্থেই আরবিআইয়ের নিয়ম পরিবর্তন করেনি, কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্যও আইন-কানুন পরিবর্তন করেছে।''

খণ্ডন : আরবিআই জানিয়েছে যে পর্যাপ্ত মূলধন, উন্নত সম্পদ ও প্রভূত আয়বৃদ্ধির কারণে ভারতীয় ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল। ২০২২-'২৩ আর্থিক বছরের আরবিআই রিপোর্ট অনুযায়ী, দু-অঙ্কের (ডবল ডিজিট) ক্রেডিট বৃদ্ধি-সহ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলির সামনে আমানত, ঋণদানের উপযুক্ত গ্রাহক, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে আয় বাড়ানো এবং পরিচালন ব্যয় কমানোর মতো চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ সমূহ ব্যাংকের কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা বাড়ায়। কমায় না। আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে একাধিক ব্যাংক সংযুক্তীকরণের ফলে অধিকাংশ আর্থিক সূচকে অধিগ্রহণকারী ব্যাংকগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে। লিক্যুইডিটি (নগদ অর্থের যোগান বা সরবরাহ), মূলধনের পর্যাপ্ততা, আর্থিক লাভজনকতা বাড়িয়ে এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা অনুৎপাদক ঋণ) কমাতে সক্ষম হয়েছে ব্যাংকগুলি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সবচেয়ে মজবুত অবস্থায় আছে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের (অর্থাৎ ভারতের) ব্যাংকগুলি।

লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংক ও ইয়েস ব্যাংক দুটিই বেসরকারি ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলিতে ভারত সরকারের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। উভয় ব্যাংক শিডিউলড্ কমার্শিয়াল (বাণিজ্যিক) ব্যাংক হওয়ায় কঠোরভাবে আরবিআই-এর তত্ত্বাবধানে ও নজরদারির অধীনে রয়েছে। লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংক গত কয়েক বছরে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে এই ব্যাংকটির মূলধন কাঠামোটি হয়েছে ক্ষয়প্রাপ্ত। দেশে কোনো গ্রহণকারী সংস্থা না থাকায় ২০২০ সালের ১৭ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বৃহত্তম ঋণদাতা ডিবিএস ব্যাংকের ভারতীয় ইউনিটের সঙ্গে লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংককে একীভূত (ব্যাংক মার্জার) করতে বাধ্য হয় আরবিআই। আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্মীবিলাস ব্যাংকের ইক্যুইটি ছাড়াও সম্পদ ও আর্থিক দায়গুলি (অ্যাসেট-লায়াবিলিটিজ) ডিবিএস ব্যাংককে হস্তান্তর করা হয়। ইয়েস ব্যাংকও পতনের মুখে পর্যবসিত হয়েছিল। ব্যাংকের পরিচালন বোর্ড তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করে বেল-আউট প্যাকেজ তৈরি করেছিল। ইয়েস ব্যাংকের অস্তিত্ব রক্ষায় এই ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় আরবিআই-এর উদ্যোগে এসবিআই, এলআইসিআই, এইচডিএইসি ব্যাঙ্ক ও আইসিআইসিআই ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন (মিনিমাম ক্যাপিটাল বাফার) হিসাবে ইয়েস ব্যাংককে ২৪ হাজার কোটি টাকার ইক্যুইটি সাপোর্ট (আর্থিক সহায়তা) দিয়েছে। বর্তমানে ইয়েস ব্যাংক পুরোপুরি ভাবে সংকটমুক্ত। আরবিআই দ্বারা প্রযুক্ত এই বেল-আউট ব্যবস্থা সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঠিক কতটা শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একের পর এক ব্যাংক যখন লিকুইডেশনে যাচ্ছে (অর্থাৎ দেউলিয়া ঘোষিত হচ্ছে), সেই সময় মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ থাকছে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এমনকী সম্প্রতি চীনে আবাসন ক্ষেত্র (রিয়েল এস্টেট) ডুবে যাওয়ার কারণে চীনের ব্যাংকগুলিও দেউলিয়া হওয়ার মুখে। ফলে চীনা আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়।

ডিএইচএফএল হলো একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তহবিল তছরুপ-সহ পূর্ববর্তী পরিচালকদের (ওয়াধাওয়ান ভ্রাতৃদ্বয়ের) ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য বিশাল অনুৎপাদক ঋণে (এনপিএ) ডুবে যায়। এনসিএলটি আদালতে রেজোলিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংস্থা পিরামল গ্রুপের হাতে চলে যায়। ভারত সরকার 'বাসেল-৩ চুক্তি' অনুযায়ী সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলিকে ৩.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা মূলধন প্রদান করেছে। ইউপিএ সরকারের নির্দেশে বেপরোয়া ভাবে ক্রেডিট বা ঋণদানের দরুন ব্যাংকগুলি ক্রমাগত লোকসানের মুখে পড়ায় এই পদক্ষেপ ছিল আবশ্যক।

মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী হলে যে কোনো অর্থনীতির ভিত নড়িয়ে দেয়, নাগকিরদের পকেটে সৃষ্টি করে প্রবল চাপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশলী নেতৃত্বে দেশীয় অর্থনীতি পরিচালনার ফলে এই সাধারণ নির্বাচনে মুদ্রাস্ফীতি কোনো নির্বাচনী ইস্যু নয়। তাঁর কার্যকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বিগত সব প্রধানমন্ত্রীদের মেয়াদের চেয়ে কম। □

কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন চাই

ধর্মানন্দ দেব

আগামী মাসে গঠিত হবে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার। সাতদফা নির্বাচনের বেশিরভাগ আসনের জন্য চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিয়েছেন মানুষ। বাকি আসনের ভোট হবে আগামী ১ জুনের মধ্যে। তাই একাংশ মানুষের মধ্যে রেজাল্ট জানার এখন এক অদম্য আগ্রহ। আবার একাংশ মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়া নিয়ে চিন্তা। নির্বাচন কমিশন ভোটের সাতদফা শেষ হওয়ার আগে কোনও জনমত বা বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ বা প্রচার করা 'নিষিদ্ধ' করেছে। তাই মানুষের আগ্রহ আরও বেড়ে গিয়েছে বলা যায়। এই আবহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর সম্প্রতি ৬৭ পৃষ্ঠার জনসংখ্যা সংক্রান্ত এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। অনেকেই এখন রিপোর্টের বিশ্লেষণ না করে শুধু রাজনৈতিক রং দেওয়া নিয়েই ব্যস্ত।

সে যাইহোক, আমরা দেখে নেবো রিপোর্টে কী রয়েছে। রিপোর্টের প্রথম পাতায় স্পষ্ট উল্লেখ করা রয়েছে, ১৯৫০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার কতটা অংশ (শেয়ার) রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্যের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণে বিশ্বের ১৬৭ দেশকে শামিল করা হয়েছে। 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অংশীদারিত্ব--- এক আন্তঃদেশীয় বিশ্লেষণ' (Share of Religious Minorities– A Cross-Country Analysis) শিরোনামের ওই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে যে ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিচার করলে ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ৭.৮২ শতাংশ। সেই সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের জনসংখ্যা ৪৩.১৫ শতাংশ বেড়েছে। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও শিখদের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পার্সি ও জৈনদের জনসংখ্যা কমেছে। কেবল ভারত

নয়, এই সময়সীমায় গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার তথ্য নিয়েই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা মণ্ডলী।

সেখানে দেখা যাচ্ছে, ৬৫ বছরে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা বেশ অনেকটাই কমে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারতের নাগরিক ছিলেন ৮৪ শতাংশ হিন্দু। কিন্তু পরের ৬৫ বছরে ছবিটা বেশ পালটে গিয়েছে। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৮ শতাংশ কমেছে হিন্দু জনগণের সংখ্যা। ২০১৫ সালে ৭৮ শতাংশ হিন্দু বসবাস করছেন ভারতে। তবে ভারত ছাড়াও এই সময়ের মধ্যে নেপালে কমেছে হিন্দু জনতার সংখ্যা। ৩.৬ শতাংশ কমেছে সেদেশের হিন্দু জনসংখ্যা। মিয়ানমারের থেরাভাডা বৌদ্ধদের সংখ্যা কমেছে ১০ শতাংশ। তবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের মতো মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে বেড়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানাদের সংখ্যা। বাংলাদেশে ১৮.৫ শতাংশ বেড়েছে মুসলমান জনসংখ্যা। ভুটান ও শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭.৬ ও ৫.২৫ শতাংশ বেড়েছে।

শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশেও হিন্দু জনসংখ্যা কমছে। আমরা যদি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জনশুমারি নিয়ে পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাব বাংলাদেশে এখন মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। সেখানে বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা। অন্যদিকে, হিন্দুদের মতোই কমছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মালম্বীদের সংখ্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে, ২০১১ সালের জনশুমারিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৯০.৩৯ শতাংশ। এবার সেটা বেড়ে হয়েছে ৯১.০৪ শতাংশ। অন্যদিকে আগেরবারের তুলনায় এবারের জনশুমারিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ১ শতাংশ কমেছে। ২০১১ সালের জনশুমারি অনুসারে, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ৮.৫৪ শতাংশ। এখন সেটা কমে হয়েছে ৭.৯৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের এই জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হিন্দুর বসবাস সিলেট বিভাগে। সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ১৩.৫০ শতাংশ। সবথেকে কম হিন্দু বাস করে ময়মনসিংহে সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৩.৯২ শতাংশ। এছাড়াও রংপুর বিভাগে ১২.৮ শতাংশ, খুলনায় ১১.৫২ শতাংশ, বরিশালে ৮.২৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৬.৬১ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৫.৬৭ শতাংশ বাসিন্দা হিন্দু। ঢাকা বিভাগের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬.২৫ শতাংশ হিন্দু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, জেলার দিক থেকে বিচার করলে হিন্দু ধর্মাবম্বী সবচেয়ে বেশি আছে গোপালগঞ্জে। সেখানের মোট বাসিন্দার ২৬.৯৪ শতাংশ হিন্দু বলে জানানো হয়েছে। এর পরই আছে মৌলভী বাজার জেলা। সেখানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট বাসিন্দার ২৪.৪৪ শতাংশ। বাংলাদেশে হিন্দুদের বসবাস করার ক্ষেত্রে তৃতীয় সর্বোচ্চ জেলা হচ্ছে ঠাকুরগাঁও। সেই জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রয়েছেন ২২.১১ শতাংশ। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অনুপাত সবচেয়ে বেশি আছে ময়মনসিংহ বিভাগে। সেখানে মোট বাসিন্দাদের মধ্যে ৯৫.৫৪ শতাংশই মুসলমান। তারপরেই আছে রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর। আর সবচেয়ে কম মুসলমান ধর্মাবলম্বী আছেন সিলেট বিভাগে। সেই বিভাগের বাসিন্দাদের মধ্যে ৮৬.১৭ শতাংশ মুসলমান। জামালপুর জেলার ৯৮.৩৩ শতাংশ বাসিন্দাই মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

আইন হোক সমগ্র ভারতে দুই সন্তানের বেশি নেওয়া যাবে না। তিনটি নিলেই আদালতে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। প্রয়োজনে শাস্তির বিধান রাখা হোক।

ফিরে আসি ভারতের কথায়। ভারতের স্বাধীনতার আগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জনসংখ্যা সংক্রান্ত একটি উপ-কমিটি গঠিত হয়েছিল যাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তারপর, ১৯৫৬ সালে একটি কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড তৈরি করা হয়েছিল যা ভ্যাসেকটমির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিষয়টিকে জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আজকে একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই : জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করবে।' তিনি আরও বলেন যে, যারা ছোটো পরিবারের নীতি অনুসরণ করে তারাও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখে। এটাও একধরনের দেশপ্রেম।'

আমাদের দেশের বেকারত্বের নেপথ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা কারণ হিসেবে কাজ করছে। একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে তাই জনসংখ্যার ভয়াল বিস্ফোরণের লাগাম টেনে ধরা জরুরি হয়ে পড়েছে। চীনে এক সন্তান নীতি প্রয়োগ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শতভাগ সফল হয়েছে। ভারত এখনই এ নীতি গ্রহণ না করতে পারলেও দুই সন্তান নীতি বাধ্যতামূলক করা জরুরি। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, দুই সন্তানই যথেষ্ট। বিষয়টি শুধু প্রচার ও গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। এখনই আইন করে ঘোষণা করতে হবে সমগ্র ভারতে দুই সন্তানের বেশি নেওয়া যাবে না। তিনটি নিলেই আদালতে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। প্রয়োজনে শাস্তির বিধান রাখা হোক। তাই নতুন আইন প্রণেতাদের কাছে সমগ্র ভারতের জন্য কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ণের আগাম দাবি রইল।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

মধুকর মালসে চব্বিশ পরগণায় সঙ্ঘের কাজের মোড় ফিরিয়েছিলেন

বিজয় আঢ্য ॥ সালটা ১৯৬৪-৬৫ হবে। রাজপুর শাখায় তরুণ স্বয়ংসেবকদের দণ্ডের (লাঠি) ক্রমিকা-৪ শেখাচ্ছি। এমন সময় বাচ্চুদা (ভূমানন্দ পাল) একজন বেঁটেখাটো ফর্সা যুবককে নিয়ে শাখায় এলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই দণ্ডের আরও একটি প্রয়োগ শেখাতে শুরু করলেন। সেইই প্রথম পরিচয়। নাম মধুকর বিনায়ক মালসে। আমাদের কাছে মধুদা। অখণ্ড ২৪ পরগনা জেলার প্রচারক। যা আজকে দুটি বিভাগ ও ৬টি জেলার সমষ্টি। যতটা মনে আছে, পুরো পরগনাতে শাখার সংখ্যা ১৫-১৬ হবে। ব্যারাকপুরে ফটিক বাজারের কাছে যে কার্যালয় ছিল, তাতেই বৈঠক হয়ে যেত। মধুদা আসাতে শুধু উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা বৈঠকে কলকাতার ২৬নং হলঘর ভরে গিয়েছিল। মানে ২৪ পরগনার সঙ্ঘের কাজ একটা মোড় নিয়েছিল। পরে জেলা উত্তর ও দক্ষিণ হিসেবে বিভক্ত হয়েছিল। বিড়লাপুর, সোনারপুর, দমদম, বেলঘরিয়া, শ্যামনগর শাখা থেকে একটু একটু করে বারুইপুর, বারাসাত, বজবজ, বেহালা, নৈহাটিতে শাখা হতে লাগল। শীতশিবির হলো। বেশ কয়েকজন নতুন কার্যকর্তাকে দেখলাম। বেশ উৎসাহের পরিবেশ। ২৪ পরগনার সঙ্ঘের কাজের এই যে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া, তার অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন মধুদা— মধুকর মালসে।

আমাদের সেই মধুদা গত ২৫ এপ্রিল, মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার চিপলুনে নিজের বাড়িতে ৮৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বাজাজ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি ছেড়ে পূজনীয় শ্রীগুরুজীর ইচ্ছানুসারে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজের জন্য আসেন। প্রায় আট বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গেই ছিলেন। মহারাষ্ট্রের ধুলে জেলাতেও তিনি কিছুদিন প্রচারক ছিলেন। পরে চিপলুনে আয়ুর্বেদিক ম্যানুফাকচারিং কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর কর্মকুশলতা ও মধুর ব্যবহারে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

মহারাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। অনেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। দিলীপ আঢ্য, দীপেন দে, অমর ভদ্র, সুভাষ নন্দী, জগন্নাথ মিত্র, মতিলাল বর্মার মতো স্বয়ংসেবকদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। নতুন শুরু হওয়া বারুইপুর (সুখদেবপুর) শাখাতেও তিনি গিয়েছেন। বছর দশ-বারো আগে তিনি স্বস্তিকাতেও এসেছিলেন। যিনিই তাঁর সম্পর্কে এসেছেন, আপনত্ব অনুভব করেছেন। স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ বীরভূম জেলার খয়রাশোল খণ্ডের ব্যবস্থা প্রমুখ সোমনাথ নন্দীর মা উর্মিলা নন্দী গত ২৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৯ পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় গত ৮ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি শাখা কার্যবাহ, বীরভূম জেলা কার্যবাহ, বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ, বিদ্যাভারতীর জেলা সমিতির সম্পাদক প্রভৃতি দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর সময় বীরভূম জেলায় ২০০ শাখা হয়েছিল। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সিউড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করতেন।

* * *

বেহালা পর্ণশ্রীর স্বয়ংসেবক বিকাশ শর্মার মাতৃদেবী পুষ্পাদেবী গত ১০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ১ পুত্র ও পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সহজ সরল ব্যক্তিত্বের কারণে মায়াদি ছিলেন সকলের প্রিয়

শিবানী চ্যাটার্জী

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজ শুরু হওয়ার প্রথম লগ্ন থেকে যাঁরা স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের অন্যতম শ্রীমতী রেবেকা মিত্র, যিনি সমিতিতে মায়া মিত্র নামে পরিচিত। মায়াদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অন্যতম বিশিষ্ট কার্যকর্তা প্রয়াত সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্রের সহধর্মিণী ছিলেন। সেই সূত্রেই বিবাহ পরবর্তীকালে সঙ্ঘের বিশিষ্ট কার্যকর্তা ডাঃ সুজিত ধর, কালিদাস বসুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ধীরে ধীরে সঙ্ঘ মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন সঙ্ঘের বহু বিশিষ্ট কার্যকর্তাকে। সাংবাদিক হাওয়ার সুবাদে স্বামী অসীম কুমার মিত্র জরুরি অবস্থায় সাংবাদিকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। সেই কঠিন অভিজ্ঞতার মোকাবিলাও করেছেন মায়াদি।

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী মায়া মিত্রের জন্ম বরানগরের চৌধুরী পার্কের চৌধুরী পরিবারে। বাবা শৈলেশ চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন চিকিৎসক। তাঁদের বাড়িতেই ছিল ল্যাবরেটরি সেখানে তিনি রোগীদের প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। শৈলেশ চন্দ্র চৌধুরীর সেই ল্যাবরেটরিতেই সপ্তপদী সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল। খুব ছোটো বয়সে মায়াদিরা বরানগরের বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন উত্তর কলকাতার হাটখোলায়। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা যখন মারা যান, তখন মায়াদি-সহ এগারোটি ভাই-বোন সকলেই বেশ ছোটো। ফলে পড়াশোনা বেশ কষ্ট করেই শেষ করতে হয়েছে সকলকে। বউবাজারের মিত্র পরিবারের বড়ো বউ হয়ে যখন এলেন, আটটি ননদ দেওরের প্রায় সকলেই পড়াশোনা করছে। বড়ো সংসারে কীভাবে সবকিছু সামলাতে হয় তা তিনি ভালোই জানতেন।

স্বামী অসীম মিত্রের কাজের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে বউবাজার থেকে চলে আসেন হরি ঘোষ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় অসীম মিত্র গ্রেপ্তার হন। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন চার মাস। এই পর্বে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তৎকালীন কার্যবাহিকা শ্রীমতী প্রতিমা বসু প্রায়ই আসতেন তাঁদের বাড়িতে বড়ো বোনের মতো ভরসা দিতে, পাশে থাকতে। এই পর্বেই সমিতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এরপর সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তিনি লেগে পড়লেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজে। সঙ্ঘের কার্যকর্তা মণিমোহন কর্মকারের ছিদাম মুদি লেনের বাড়িতে শুরু হলো সমিতির শবরী শাখা। সেই শাখায় যাতায়াত, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ চলতে থাকে। গান ছিল মায়াদির প্রাণ। গাইতেনও খুব ভালো। সমিতির সেবিকাদের কত যে গান শিখিয়েছেন তার কোনো হিসেব নেই। সেই সঙ্গে লেখালেখিও করতেন। বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতেন বাংলা শব্দ ছক। মায়াদির বাড়িতে গেলে দেখা যেত সাদা কাগজে খোপ কেটে চলছে শব্দছক মেলানোর প্রস্তুতি।

১৯৮০ সালে শিশুপুত্র অর্ণবকে সঙ্গে নিয়ে লিলুয়ায় সমিতির শিক্ষা বর্গে যোগদান করেন মায়াদি। লেখার হাত খুব ভালো ছিল। বৌদ্ধিক বিভাগের দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন। সে সময় ছাপার কাজ এত সহজ ছিল না। বৌদ্ধিক পত্র প্রকাশ করা, 'কর্মযোগিনী মৌসিজী', 'অগ্নিযুগের বঙ্গললনা'-সহ যেসব সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে মায়াদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অগ্নিযুগের বঙ্গললনা লেখার সময় বিপ্লবী হেলেনা দত্তের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বের করে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়ে তবে লেখা শেষ করেন।

সমিতির শাখায় নিয়মিত উপস্থিতির উপর জোর দিতেন। নানা বই থেকে নির্বাচিত অংশ লিখে রাখতেন, সেগুলি বৌদ্ধিকের কাজে লাগবে বলে। অকপট মায়াদি রেখে ঢেকে কথা বলতে পারতেন না। মন ও মুখ ছিল এক। তাঁর প্রাণোচ্ছল হাসিখুশির ভাব ছড়িয়ে পড়তো সকলের মধ্যেই। ঘরে বাইরে একই রকম।

১৯৯৬ সালে হরিঘোষ স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে বেহালায় নিজের বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতেই শুরু করেন সারদামণি শাখা। শারীরিক কারণে বহুদিন বাড়ির বাইরে বেরোতেন না। কিন্তু কাজ কখনো থামাননি। মায়াদির সহজ সরল ব্যক্তিত্বের কারণে বয়সে ছোটো সেবিকারাও সহজভাবে মিশতে পেরেছে তাঁর সঙ্গে। বেশকিছু সেবিকা তৈরি করে গেছেন— যারা যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে আজও সমিতির কাজ করে চলেছেন। রেখে গেলেন নিজের লেখাগুলি, যেগুলো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অমূল্য সম্পদ।

বিশেষ সক্ষমতাকে জয় করে উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্য অর্জন পায়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৮ মে প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। বিশেষ ভাবে সক্ষম পায়েল রায় ছিলেন এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। দিব্যাঙ্গ বোন পায়েলের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কামারপাড়ায়। বাদামাইল এলপি হাই স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী পায়েল। বিশেষ শারীরিক সক্ষমতাকে জয় করে পায়েল এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে ৪৬০ নম্বর পেয়েছেন। সব প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জয়ী পায়েল প্রমাণ করে দিয়েছে যে অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তির সামনে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত পায়েল নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে বা বসতে পারে না। তাঁর মা তাঁকে কোলে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ভবিষ্যতে ভূগোলে অনার্স- সহ উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা রয়েছে এই দিব্যাঙ্গ, মেধাবী বোনটির। গত ১০ মে সক্ষমের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কমিটি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে পায়েলকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত সকলে বিশেষ শারীরিক সক্ষমতা জয়ী, দিব্যাঙ্গ বোনটির সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করেন।

ভারতে ক্রমশ কমছে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ হলো ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ বা ইএসি-পিএম (ইকোনমিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার) হতে সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ক্রমশ কমছে হিন্দুদের সংখ্যা। ১৯৫০ থেকে ২০১৫ সাল অবধি হওয়া জনগণনা ও সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে উল্লেখযোগ্য হারে কমছে হিন্দুদের অনুপাত। এই ৬৫ বছরে ভারতে ৭.৮২ শতাংশ হারে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার কমেছে। এর বিপ্রতীপে গত ৫০ বছরে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩.১৫ শতাংশ। খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫.৩৮ শতাংশ। ভারত ছাড়াও নেপালে ৩.৬ শতাংশ কমেছে হিন্দুরা। ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৯৬ কোটি, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ কোটিতে। ২০২৪ সালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যে সংখ্যায় পৌঁছেছে, তাতে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়াকেও টপকে গিয়েছে ভারত। ভারতে জনসংখ্যার আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার বা রিলেটিভ গ্রোথ রেটের পর্যালোচনাতেও উঠে এসেছে উদ্বেগজনক চিত্র। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯.৮ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৩ শতাংশে। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৮৪.৩ শতাংশ। বর্তমানে হিন্দুদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৮.০৬ শতাংশে। জনসংখ্যার এই আপেক্ষিক বৃদ্ধি হারের পেছনে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের টিএফআর (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) বা গড় প্রজনন হার। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ১৯৫১-১৯৬১— এই দশ বছরে হওয়া একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, মুসলিম মহিলাদের ফার্টিলিটি রেট ছিল— ৪.১। অর্থাৎ একজন মুসলিম মহিলা গড়ে চারের অধিক সন্তান ধারণ ও জন্মদানে সক্ষম ছিলেন। সেই সময়কালে হিন্দুদের ক্ষেত্রে টিএফআর ছিল— ৩। বর্তমানে হিন্দু মহিলাদের টিএফআর দাঁড়িয়েছে দুইয়েরও কম— ১.৮। মুসলিমদের টিএফআর বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২.৪-এ। মুসলিম ও হিন্দুদের টিএফআর-এর এই পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ০.৬-এ যা ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে জনবিন্যাসের ভারসাম্যে ঘটিয়েছে এক ব্যাপক পরিবর্তন। এছাড়াও রিপ্লেসমেন্ট রেট হলো এই ক্ষেত্রে গণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। অর্থাৎ যত মানুষ মারা যাচ্ছেন তার তুলনায় সমসংখ্যক শিশু জন্ম হলে অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়লে সেটিকে বলা হয়— ওয়েল রিপ্লেসমেন্ট রেট। ভারতে রিপ্লেসমেন্ট রেট হলো— ২.১। মুসলিমদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি (অর্থাৎ টিএফআর) এই রিপ্লেসমেন্ট রেট অপেক্ষা অনেক বেশি। এর বিপ্রতীপে, হিন্দুদের টিএফআর এই রিপ্লেসমেন্ট রেট অপেক্ষা অনেক কম। প্রতি ২.১ জন হিন্দুর মৃত্যুর তুলনায় জন্মাচ্ছে ১.৮ জন। অধিক সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়াও আধুনিক সমাজ, উন্নত জীবনশৈলী সম্পর্কে চূড়ান্ত অসচেতনতা বা গজওয়া-এ-হিন্দের লক্ষ্যে সুচিন্তিত, সচেতন পদক্ষেপ, মাদ্রাসা শিক্ষা, শরিয়তি আইনের প্রভাব, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্যাপক হারে অবৈধ অনুপ্রবেশ হলো মুসলিমদের এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে আসল কারণ। একইসঙ্গে পরিবার পরিকল্পনায় উদাসীন, উন্নতমানের জীবনযাত্রা সম্পন্ন হিন্দুদের ক্রমশ সংখ্যাহ্রাস দেশের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ভালো বার্তা নয়। এই ঘটনা ভারতের জনবিন্যাসের ভারসাম্যকেই শুধু পরিবর্তন করবে না, পপুলেশন জেহাদের কারণে ভারতের এই ডেমোগ্রাফি পাল্টে যাওয়া ভয়াবহ কুপ্রভাব বিস্তার করবে দেশের রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রে।

কুলিক বনাঞ্চলের ঘনত্ব কমছে, কমছে জলস্তর, উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ পাখিরালয় হলো কুলিক। এই পাখিরালয়ের 'জীবনরেখা' কুলিক বনাঞ্চলের ঘনত্ব দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে। গ্রীষ্মের এই তাপপ্রবাহের মধ্যে কুলিক নদীর জলস্তর ভয়ংকরভাবে নীচে নামছে। মাটির তলার জলস্তরের সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রবলতর। ফলে ছয় দশকের কুলিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সবুজায়নের গরিমা কার্যত বিবর্ণ পাতার মতো খসে পড়ার উপক্রম।

নদী বিশেষজ্ঞদের যুক্তি, অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের জেরে মাটির তলার জলস্তর দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে নদীর জলস্তর। মৃত্তিকার আর্দ্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে প্রভাবিত হচ্ছে গাছের প্রজনন ক্ষমতাও। কমে যাচ্ছে হরেক প্রজাতির গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। সংকটের মুখে বৈচিত্র্যময় ও ভেষজ গুণে ভরা গাছেদের ভবিষ্যৎ। কুলিক অভয়ারণ্যে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যাও ক্রমেই নিম্নমুখী। উদ্বিগ্ন নদী বিশেষজ্ঞ-সহ প্রকৃতিপ্রেমীরা।

১৯৭০ সালে রায়গঞ্জ শহরের অদূরে সাবেক ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাড়ে কুলিক নদীর ধারে বট, অশ্বত্থ, শিশু, সেগুন, হিজল, কালকাসুন্দা প্রভৃতি গাছের উপস্থিতিতে জেগে ওঠে নিবিড় বনভূমি। পরবর্তী কালে কদম, পাকুড়, জারুল, ইউক্যালিপটাসের মাধ্যমে চলে ব্যাপক বনসৃজন। বর্তমানে এই বনাঞ্চলের

আয়তন প্রায় ১.৩ বর্গকিলোমিটার। আশির দশক থেকে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ঝাঁকে ঝাঁকে এশিয়ান ওপেনবিল স্টর্ক-সহ নাইট হেরন, লিটল্ কর্মোর‍্যান্ট, লিটল্ এগ্রেট প্রভৃতি পাখিরা বর্ষার মরশুমে এই বনভূমির গাছগুলিতে অস্থায়ী বাসা বেঁধে বংশবিস্তার শুরু করে। এই বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হলেও কুলিকে এখনও পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলেনি। এর জন্য বনভূমির ঘনত্বের সংকীর্ণতাকেই দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা। আর বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়ার নেপথ্যে কাজ করছে নদী ও ভৌম জলস্তরের ব্যাপক তারতম্য। এই বিষয়টিকে তুলে ধরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক রূপক পাল বলেন, 'একদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কম হওয়ায় নদীর তলার জলস্তর হু হু করে নামছে। অন্য দিকে উচ্চফলনশীল বোরো ধান চাষে প্রয়োজনীয় সেচের জন্য মাটির তলার জল পাম্প লাগিয়ে নাগাড়ে উত্তোলন এবং নির্বিচারে ব্যবহার চলছে। তাতেই মাটির তলদেশের স্বাভাবিক জলস্তর দ্রুত গতিতে নীচে নামায় মৃত্তিকার আর্দ্রতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রভাব পড়ছে বনাঞ্চলের গাছগুলির বংশবিস্তারে। ব্যাহত হচ্ছে গাছেদের বংশবিস্তার। বড়ো বড়ো গাছের নীচে ছোটো গাছ জন্ম নিচ্ছে না। বনের বিকাশ থমকে যাচ্ছে'। তিনি আরও জানান যে, গ্রীষ্মে উত্তর দিনাজপুরের অধিকাংশ নদী জলহীন চেহারার রূপ নেয়। একসময় ২৬টি নদী ছিল। জল সংকটে সিংহভাগ নদী এখন মৃতপ্রায়। একমাত্র ভরসা বৃষ্টির জল। বর্তমানে সুই, শ্রীমতি, বিনা, গামারি প্রভৃতি নদী শুকিয়ে খটখটে।

বোরো ধান চাষে একবিঘায় কমপক্ষে ১৫০০ মিলিমিটার জল প্রয়োজন। মাটির তলার জল উত্তোলনে জনবসতির বৃদ্ধিও দায়ী বলে জানান পরিবেশবিদ বানারহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য।

চীনের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ মহড়ায় বাংলাদেশ সেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের সঙ্গে সখ্য বাড়ছে বাংলাদেশের। এই প্রথমবার যৌথ যুদ্ধ মহড়ায় বাংলাদেশ ও চীনা সেনা। গত ২৫ এপ্রিল চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যম শিনহুয়া ও সংবাদপত্র পিপল্‌স ডেইলি জানিয়েছে, মে মাসের গোড়ায় এই যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার পরিসর এবং ব্যবহারিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মে মাসে যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে চীনা পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র একটি দল বাংলাদেশে যাবে।

চীন-বাংলাদেশ প্রথম যুদ্ধ মহড়ার ওপর নয়াদিল্লি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সামরিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। যদিও এই নিয়ে সংযত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত সরকার। গত ২৫ এপ্রিল সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ অথবা অন্য কোথাও সব ধরনের ঘটনার উপরেই আমরা নজর রাখি। বিশেষ করে সেই ধরনের ঘটনা, যা আমাদের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে'।